হিরের আংটি
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

হিরের আংটি

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

প্রথম সংস্করণ: জুন ১৯৮৬
প্রথম ই-বুক সংস্করণ: ২০২০

ISBN 978-81-7066-837-4 (print)
ISBN 978-93-9040-597-8 (e-book)

প্রকাশক: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
হেড অফিস: ৯৫ শরৎ বোস রোড, কলকাতা ৭০০ ০২৬
রেজিস্টার্ড অফিস: ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯

CIN: U22121WB1957PTC023534

অলংকরণ: দেবাশীষ দেব

"রা—স্বা"

শ্রীমতী তমালী বসু

শ্রীমতী জয়া বসু-কে

আমাদের প্রকাশিত এই লেখকের অন্যান্য বই

অঘোরগঞ্জের ঘোরালো ব্যাপার
অষ্টপুরের বৃত্তান্ত
উঁহু
কিশোর উপন্যাস সমগ্র (১-৪)
কুঞ্জপুকুরের কাণ্ড
গজাননের কৌটো
গোঁসাই বাগানের ভূত
গোলমেলে লোক
গৌরের কবচ
চক্রপুরের চক্করে
ছায়াময়
জং বাহাদুর সিংহর নাতি
ঝিকরগাছায় ঝঞ্ঝাট
ঝিলের ধারে বাড়ি
ডাকাতের ভাইপো
দশটি কিশোর উপন্যাস
নৃসিংহ রহস্য
পটাশগড়ের জঙ্গলে
পাগলা-সাহেবের কবর
পাতালঘর
বক্সার রতন
বটুকবুড়োর চশমা
বনি
বিপিনবাবুর বিপদ
ভুতুড়ে ঘড়ি
ভোলু যখন রাজা হল
মদন তপাদারের বাক্স
মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি
মোহনরায়ের বাঁশি
রাঘববাবুর বাড়ি
ষোলো নম্বর ফটিক ঘোষ
সর্বনেশে ভুল অঙ্ক

দুধসায়রের দ্বীপ
নন্দীবাড়ির শাঁখ
নবাবগঞ্জের আগন্তুক
নবীগঞ্জের দৈত্য
সাধুবাবার লাঠি
সোনার মেডেল
হাবু ভূঁইমালির পুতুল
হেতমগড়ের গুপ্তধন

সূচিপত্র

॥ এক ॥

টিপকল পাম্প করে যে লোকটা ঘোঁত-ঘোঁত করে জল খাচ্ছিল, তাকে আলগা চোখে লক্ষ করছিল ষষ্ঠী। লোককে লক্ষ করাই ষষ্ঠীর আসল কাজ।লোকটা বোকা না চালাক, সাহসী না ভিতু, গরিব না বড়লোক, এসব বুঝে নিতে হয়। তারপর কাজ।

ষষ্ঠীর কাজ হল দুনিয়ার বোকাসোকা লোকদের ট্যাঁক ফাঁক করা। চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, গুম আর জখম সে নেহাত কম করেনি, খুনটা এখনও বাকি। দিনকাল যা পড়েছে, তাতে এবার খুনটুনও করে ফেলতে পারে যে-কোনও দিন।

সময়টা ষষ্ঠীর বড় ভাল যাচ্ছে না। গত ছ'মাসে সে দু'বার ধরা পড়েছে। এক সোনার বেনের বাড়িতে ঢুকে তাদের অ্যালসেশিয়ান কুকুরের খপ্পরে পড়ে গিয়ে খুব নাকাল হয়ে পালানোর সময় ফটকের বাইরে পাড়ার নাইটগার্ডরা তাকে ধরে এবং পেটায়। দ্বিতীয়বার এক বুড়ো মানুষের হাত থেকে ফোলিও ব্যাগ নিয়ে পালানোর সময় সেই বুড়ো লোকটা তাকে হাতের ছাতাটা দিয়ে খুব ঘা-কতক মেরে ঘায়েল করে ফেলে। সোনার বেনের বাড়িতে সে কিছু চুরি করতে পারেনি, আর ধরাও পড়েছিল বাড়ির বাইরে। আর বুড়ো মানুষটা কেন যেন শেষ অবধি তার বিরুদ্ধে কেসটা করতে চায়নি। তাই দু'বারই অল্পের ওপর দিয়ে রেহাই পেয়ে গেছে সে। থানার বড়বাবু তাকে ভালই চেনেন। রুল দিয়ে কয়েক ঘা মেরে বলেছেন, "ধরাই যদি পড়বি তো চুরি-ছিনতাই করতে যাস কেন? এর পরের বার যদি বেয়াদবি দেখি, তা হলে তোরই একদিন কি আমারই একদিন।"

কিন্তু বড়বাবুর কথায় কান দিলে তো ষষ্ঠীর চলবে না। তারও খিদেতেষ্টা আছে, সংসার আছে।

মফস্বল শহরের গ্রীষ্মের দুপুর। গলিটা খাঁখাঁ করছে। পটলবাবুদের গাড়িবারান্দায় ছায়ায় বসে ষষ্ঠী চারদিকে নজর করতে-করতে লোকটাকে আবার দেখল। অনেকক্ষণ ধরে জল খাচ্ছে, চোখে মুখে ঘাড়ে জল চাপড়াচ্ছে। লোকটাকে দেখার অবশ্য কিছুই নেই। কুড়ি-বাইশ বছরের ছোকরা। গায়ের জামাকাপড়ের অবস্থা কহতব্য নয়। ঊর্ধ্বাঙ্গে একখানা রংচটা হলুদ পাঞ্জাবি, নিম্নাঙ্গে একখানা ময়লা আলিগড়ি পায়জামা। শুধু পায়ের জুতোজোড়া বেশ বাহারি নাগরা। পিঠে একটা ব্যাগ। মুখে দাড়িগোঁফ আছে, চুল লম্বা এবং রুক্ষ। তবে ছোকরা যে বেশ বনেদি বাড়ির ছেলে, তা চেহারায় মালুম হয়। ফর্সা রং রোদে মরে তামাটে হয়ে গেছে বটে, কিন্তু মুখখানা বেশ ধারালো। শরীরটাও বেশ বড়সড়, হাড়সার, চর্বি নেই।

জল খেয়ে ছেলেটা একটু এদিক-ওদিক তাকাল, তারপর হঠাৎ ষষ্ঠীচরণের দিকে চোখ পড়ায় গুটিগুটি এগিয়ে এসে বলল, "আচ্ছা এটাই কি কুমোরপাড়া?"

ষষ্ঠী খুব তাচ্ছিল্যের চোখে ছেলেটাকে একবার দেখে নিয়ে বলল, "হ্যাঁ, কার বাড়ি খুঁজছেন?"

ছেলেটা জবাব না দিয়ে ষষ্ঠীর পাশেই ধপ করে বসে পিঠ থেকে রুকস্যাকটা নামিয়ে রাখল। ষষ্ঠী আড়চোখে ব্যাগটা দেখে নিল একবার। ব্যাগটা পুরনো, রংচটা, ছেঁড়া এবং তাপ্পি মারা। সুতরাং ষষ্ঠীর আর দ্বিতীয়বার ব্যাগটার দিকে তাকাতে ইচ্ছে হল না। ছোকরা যে দুর্দশায় পড়েছে, তা এক পলক দেখলেই বোঝা যায়। সুতরাং ষষ্ঠী উদাসভাবে হাই তুলল।

দুপুর সময়টা নিশুত রাতের মতোই নিরিবিলি। ষষ্ঠীর কাজের পক্ষে সময়টা খুবই ভাল। কারও জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে কিছু তুলে নেওয়া, কোনও ছোট ছেলে বা মেয়েকে একা পেলে তার কাছ থেকে কিছু ছিনিয়ে নেওয়া বা কোনও বুড়োবুড়ি পেলে ছোটোখাটো লাভ ষষ্ঠীর হয়েই যায়। কিন্তু আজ দুপুরটা তেমন জুতের নয়।

ষষ্ঠী আর-একটা হাই তুলে পাশে বসা ছোকরাটার দিকে তাকাল। দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে ঢুলছে। চোখেমুখে বেশ ক্লান্তির ছাপ। মাথা আর গায়ে রঙিন ধুলোর মিহি আস্তরণ পড়েছে। আঙুলে বড়-বড় নখ, গালে একটু দাড়ি, নাকের নীচে বেশ বড়সড় গোঁফ।

আচমকাই ষষ্ঠী একটু নড়েচড়ে বসল। ছোকরার বাঁ হাতখানা হাঁটুর ওপর রাখা, আঙুলগুলো ঝুলছে। অনামিকায় একখানা আংটি। নেহাত খেলনা আংটি নয়। ষষ্ঠীর পাকা চোখ হিসেব করে ফেলল, আংটিটায় কম করেও আধ ভরি সোনা আছে। আর পাথরখানাও রীতিমত প্রকাণ্ড। এমন সাদা আর ঝকঝকে পাথর ষষ্ঠী জীবনে আর দেখেনি। যদি হিরের হয় তো এই আকারের হিরের দাম লাখ টাকা হওয়াও বিচিত্র নয়। এরকম হাড়হাভাতের আঙুলে এরকম আংটি থাকাটা অস্বাভাবিক বটে, কিন্তু অসম্ভব নয়। ছোকরা সম্ভবত পড়তি বনেদি বাড়ির ছেলে। বনেদি ঘরের পতন হলেও দু'চারটে সত্যিকারের দামি জিনিস বংশধরদের কাছে থেকে যায়।

আংটিটা চোখে পড়তেই ষষ্ঠীর শরীরটা চনমন করে উঠল, আলসেমির ভাবটা আর রইল না।

ষষ্ঠী বোকা নয়। সে জানে এই ছোকরার কাছ থেকে আংটিটা হাতিয়ে নেওয়া বড় সহজ কাজ নয়। মাথা খাটিয়ে একটা কৌশল বের করতে হবে। গায়ের জোরে বা ভয় দেখিয়ে হবে না। ছোকরা অভাবে পড়েছে বোঝাই যায়। সুতরাং বিক্রি করতে রাজি হয়ে যেতে পারে। কালী স্যাকরার সঙ্গে ষষ্ঠীর খুব খাতির। চুরি করা সোনারুপো সে কালীর কাছেই বেচে। কালীর সঙ্গে সাঁট করে আংটিটা জলের দরে কিনে নেওয়া যেতে পারে।

সূতরাং ষষ্ঠী অপেক্ষা করতে লাগল। তারপর দেওয়ালে একটা ডেঁয়ো পিঁপড়েকে বাইতে দেখে সেটাকে সাবধানে তুলে এনে ছোকরার ঘাড়ে ছেড়ে দিল।

কাজ হল। কিছুক্ষণ পরেই ছোকরা ঘাড় চুলকোতে চুলকোতে সোজা হয়ে বসল।

ষষ্ঠী খুব বিগলিত মুখে বলল, "বড্ড পিঁপড়ে ভাই। আমাকেও একটা কামড়েছে।" বলে বেশ জোরে জোরে নিজের গোড়ালি ডলতে লাগল সে।

ছেলেটা একটা ময়লা রুমালে মুখের ঘাম মুছল। তারপর উদাস চোখে চেয়ে রইল সামনের দিকে। অনেকক্ষণ বাদে বলল, "আচ্ছা, এইখানে রতনলাল বাঁড়ুজ্যের বাড়িটা কোথায় বলতে পারেন?"

ষষ্ঠী একটু চমকে উঠল। মুখের হাসিটাও মিলিয়ে গেল। গলা-খাঁকরি দিয়ে বলল, "তিনি আপনার কে হন আজ্ঞে?"

ছেলেটা মাথা নেড়ে বলল, "কেউ না, উনি ব্রাহ্মণ আমি কায়স্থ। আত্মীয়তা নেই।"

“চেনাজানা নাকি?”

ছেলেটা ফের মাথা নেড়ে বলে, “তাও নয়। তবে আমার দাদু তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলে গেছেন, আমি তাঁর কাছেই এসেছি।”

ষষ্ঠী ছোকরার আঙুলের আংটিটার দিকে চেয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। নাঃ, আংটিটা হাতানোর আর কোনও উপায় রইল না। রতন বাঁড়ুজ্যের কুটুম, জ্ঞাতি, চেনাজানা কারও কাছ থেকে কিছু হাতিয়ে নেবার মতো বুকের পাটা এ-তল্লাটে কারও নেই।

ষষ্ঠী উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে গলির উত্তর প্রান্তটা হাত তুলে দেখিয়ে বলল, “গলিটা পেরিয়ে আমবাগান আর পুকুর পাবেন। তারপর মস্ত লালরঙা বাড়ি। ওটাই রতনবাবুদের।”

ছেলেটা খুব সরল একটু হাসি হেসে বলল, "আপনি বেশ ভাল লোক, আচ্ছা, আজ তা হলে চলি।" ষষ্ঠী ফের গাড়িবারান্দার তলায় বসতে যাচ্ছিল।

ছেলেটা যেতে গিয়ে আবার ফিরে এসে বলল, "এই যে, একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম।"

"কী কথা?"

"আপনার নামটা বলবেন? ভাল লোকদের নাম জেনে রাখা ভাল।"

ষষ্ঠী একটু মাথা চুলকে বলল, "আজ্ঞে ওইখানেই তো গোলমাল। লোক যে আমি তেমন মন্দ ছিলাম না সে আমিও বুঝি। কিন্তু অন্য লোকেরা কি সে কথা মানতে চাইবে? ওই রতন বাঁড়ুজ্যের কাছেই নামটা বলে দেখুন না কেমন খ্যাঁক করে ওঠে।"

"তা নামটা কী?"

ষষ্ঠী মাথা চুলকোতে-চলকোতে বলল, "কানাই নামটা কেমন?"

"কানাই! বাঃ, বেশ নাম। আপনার নাম কি কানাই?"

ষষ্ঠী বিগলিত একটু হেসে বলল, "ঠিক কানাইও নয়, তবে কাছাকাছি আপাতত কানাই দিয়েই চালিয়ে নিন না।"

ছেলেটা ঘাড় কাত করে বলল, "বেশ। তাই হবে। আর একটা কথা।"

"আবার কী?"

"আমার হাতে এই যে আংটিটা দেখছেন, এটা বেচতে চাই। এখানে এমন আংটি কেনার লোক আছে? আমার বড় অভাব।"

ষষ্ঠী আংটির কথায় একটু থতমত খেয়ে চোখের পলকে নিজেকে সামলে নিয়ে গম্ভীর হয়ে বলল, "সোনা কতটা?"

"ওসব আমি জানি না।"

"পাথরটা ঝুটো না আসল?"

"তাও জানি না। তবে বহু পুরনো আমলের আংটি, জিনিসটা ভালই হওয়ার কথা।"

ষষ্ঠী একটু গলা-খাঁকারি দিয়ে বলল, "কথাটা পাঁচ কান করবেন না। আমার হাতে ভাল লোক আছে। বিকেলের দিকে ছটা নাগাত আমবাগানের ঈশেন কোণে চলে আসুন। আমি থাকব। ব্যবস্থা হয়ে যাবে।"

ছেলেটা ফের ঘাড় কাত করে সম্মতি জানাল। তারপর ধীর পায়ে চলে গেল।

ষষ্ঠীর বুকটা উত্তেজনায় ধড়ফড় করতে লেগেছে। আংটি যে আসল জিনিস দিয়ে তৈরি, তা সে খুব জানে। পাথরটাও হিরে হওয়াই সম্ভব। অবশ্য ছেলেটাকে সে সব জানানো হবে না। চেপেচুপে বলতে হবে। তবে এরকম একটা হাঁদা-গঙ্গারামকে ঠকানো খুব একটা শক্ত কাজও হবে বলে মনে হল না ষষ্ঠীর। মনের আনন্দে সে গুনগুন করে রামপ্রসাদী গাইতে লাগল, আমায় দাও মা তবিলদারি...।

হঠাৎ গান থামিয়ে সে ভাবল, নাঃ, ব্যাপারটা একটু দেখতে হচ্ছে। ছোকরা রতন বাঁড়ুজ্যের বাড়ি গেল কোন্ মতলবে, তাকে দেখে রতনবাবুর মুখের ভাবখানা কেমন হয়, তার একটা আন্দাজ থাকা দরকার। তাতে কাজের সুবিধে।

ষষ্ঠী উঠে পড়ল এবং হনহন করে হেঁটে আমবাগান ডাইনে রেখে রতনবাবুদের বাড়ির কাছাকাছি এসে একটা বটগাছের পিছন থেকে উঁকি মেরে দেখতে লাগল।

রতন বাঁড়ুজ্যের বাড়ি বিশাল। চারদিকে বাহারি বাগান, মাঝখানে লাল রঙের দোতলা বাড়ি। খিলান গম্বুজ মেলা। গাছপালাও অনেক। বাগানের দেওয়াল ঘেঁষে সারি-সারি শ'দেড়েক নারকোল গাছই আছে। এত দূর থেকে বাড়ির মধ্যে কী ঘটছে তা দেখাই যায় না।

ষষ্ঠী দূর থেকেই খুব উঁকিঝুঁকি মারতে লাগল। তবে এর চেয়ে কাছে এগোতে সে ভরসা পেল না। কেন যে সে রতন বাঁড়ুজ্যেকে এত ভয় পায় তা সে নিজেও জানে না। রতন বাঁড়ুজ্যে ষণ্ডাগুণ্ডা নয়, বরং তাঁকে ধার্মিক ও সজ্জন বলেই সবাই জানে। বয়সও, যথেষ্ট কিছু না হোক, সত্তর তো হবেই। তবু রতন বাঁড়ুজ্যেকে ভয় খায় না বা সমঝে চলে না বা তাঁর চোখে-চোখে তাকায়, এমন লোক এ-তল্লাটে নেই। গুণ্ডা বদমাশ চোর ডাকাত কেউই তাঁকে ঘাঁটাতে সাহস পায় না।

আসল কথা হল রতন বাঁড়ুজ্যের চোখ। অমন রক্ত-জল-করা ঠাণ্ডা চোখ ষষ্ঠী জন্মে দেখেনি। চোখের নজর যেন শরীর ফুটো করে ভিতর অবধি দেখতে পায়। তার ওপর রতন বাঁড়ুজ্যে খুবই কম কথার মানুষ। মুখখানা সবসময়েই কেমন যেন গেরামভারি গোছের। ভাল মন্দ যাই হোক, লোকটাকে অগ্রাহ্যি করার উপায় নেই কারও।

নাঃ, উঁকিঝুঁকি মেরে কোনও লাভ হল না। ফটক আর সদর-দরজার মুখটা গাছপালায় ঢাকা। ষষ্ঠী সুতরাং একটা হাই তুলে রণে ভঙ্গ দিল। আমবাগানটা এবার এক মারোয়াড়ি ইজারা নিয়েছে। আসল বেনারসি ল্যাংড়া পাকতে এখনও দেরি আছে। রাবণের মতো চেহারার দু'-দুটো চৌকিদার খাটিয়া পেতে বসে বাগান চৌকি দিচ্ছে। ষষ্ঠী তাদের সঙ্গে ভাব জমাতে কয়েকবার চেষ্টা করে দেখেছে, মোটে পাত্তা দেয় না।

আমবাগানে বেড়া আছে।ঢোকা বারণ। তবে সব বারণ শুনে চলতে গেলে ষষ্ঠীকে কবে পটল তুলতে হত। তাই তারের বেড়াটা ডিঙিয়ে আমবাগানে ঢুকে ষষ্ঠী একবার চৌকিদারদের দিকে তাকাল। একজন খাটিয়ায় শুয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। অন্যটা বসে খৈনি ডলছে। ষষ্ঠী টুক করে গোটা দুই আম পেড়ে নিল হাত বাড়িয়ে। কলমের গাছ, হাতের নাগালেই ফল। পেড়েই মাথা নিচু করে একটু চোটে হেঁটে বাগানের চৌহদ্দি ডিঙিয়ে রাস্তায় পড়ল। যা পাওয়া যায় তা-ই লাভ। দুনিয়ায় কোনওটাই তো ফেলনা নয়।

গাড়িবারান্দার তলায় বসে ষষ্ঠী ভাবতে লাগল, ছোঁড়াটা বিকেলে এলে হয়।

॥ দুই ॥

সকালবেলাটায় হাবুল থাকে তার দাদুর কব্জায়। দাদু ওঠেন রাত তিনটেয়। জপতপ সারতে চারটে বেজে যায়। শীত গ্রীষ্ম বলে কথা নেই, দেওয়াল-ঘড়িতে কাঁটায়-কাঁটায় সাড়ে চারটে বাজবার টং শব্দ হতে না হতেই দাদুর হাঁক শোনা যায়, "হাবুল!"

দাদুর গলার জোর প্রায় কিংবদন্তী। এই গলায় মরা মানুষের নাম ধরে হাঁক মারলে মড়াও উঠে বসবে। অন্তত দাদুর বন্ধু অনাথ সান্যাল, কুমুদ বোস, মহিম বিশ্বাস বা যতীন সামন্তর মতো লোক তাই বলেন। শোনা যায়, দাদুর যখন দশ বারো বছর বয়স, তখন একবার বাড়িতে ডাকাত পড়েছিল। দাদু উত্তেজিত হয়ে "ধর ব্যাটাদের, মার ব্যাটাদের" বলে এমন চেঁচিয়েছিলেন যে, ডাকাতরা ভয় পেয়ে পালিয়ে যায়।

যাই হোক, সেই গলার একটি হাঁকেই হাবুলের গাঢ় ঘুম আঁতকে উঠে পালায়। ডাক্তাররা বলে, মানুষের আট ঘন্টা ঘুম দরকার। দাদু বলেন, "দূর, চার ঘন্টা ঘুম পাড়লেই বহুত। বেশি ঘুমোলে জীবনটাকে দেখবি কখন। ঘুম বেশি করতে নেই। দুনিয়ায় কত কী দেখার আছে, বোঝার আছে, শোনার আছে, ভাবার আছে।"

কিছুদিন আগে হাবুলের পৈতে হয়েছে।.এখনও মাথা কদমফুল। সকালে উঠে তাকেও আহ্নিক করতে হয়। তারপর থানকুনিপাতা আর জল খেয়ে নিয়ে শুরু হয় দৌড়ঝাঁপ আর ব্যায়াম।

এইভাবে ঘন্টা দুয়েক ধরে দাদু তাকে তৈরি করে ছেড়ে দেন। কিন্তু তারপরও সারা দিন ধরে দাদুর একটা প্রচ্ছন্ন প্রভাব তার ওপর কাজ করতে থাকে।

স্কুলে গ্রীষ্মের বন্ধ শুরু হয়েছে। ঝাঁঝাঁ দুপুরে নিজের ঘরে বসে হাবুল হোমটাস্ক করছিল। এমন সময় তাদের ডবারম্যান কুকুরটা ঘাউ-ঘাউ করে ডেকে উঠল। হয়তো ভিখিরি বা পুরনো কাগজওয়ালা এসেছে। একটা শক্ত অঙ্ক মেলাতে গলদ্ঘর্ম হচ্ছিল হাবুল, তাই কুকুরের ডাক গ্রাহ্য করল না।

বুড়ো দারোয়ান রামরিখ কানে ভাল শুনতে পায় না, চোখেও দেখে না। তার ওপর দিনরাত হয় ঘুমোয়, না হলে বসে বসে ঢুলে। বাড়িতে কাজের লোক অবশ্য দু'চারজন আছে। তার মধ্যে পাঁচু হল প্রধান। বয়স জিজ্ঞেস করলে বলে, "দেড়শো দুশো বছর তো হবেই।" কালো, লম্বা, পাকানো চেহারা, মাথাভর্তি সাদা চুল আর একজোড়া মিলিটারি কায়দার মোটা সাদা গোঁফ সমেত পাঁচুর বয়সের আন্দাজ পাওয়া সত্যিই শক্ত। সে আবার দাদু ছাড়া বাড়ির আর কাউকে বিশেষ গ্রাহ্য করে না। বরং উল্টে তাকেই সবাই খাতির করে। কবে যে সে এ-বাড়ির কাজে ঢুকেছিল তা কেউ জানে না। হাবুলের বাবা কাকা সকলেই তাকে জ্ঞান হওয়া অবধি দেখে আসছে।

আর আছে বেণু নামে ছোকরা একটা চাকর। বেশ চালাক-চতুর আর চটপটে। তবে খুব ফাঁকিবাজ, সুখনের মা হল এ-বাড়ির বুড়ি-ঝি। সে এসেছিল হাবুলের মায়ের বাপের বাড়ি থেকে। খুব ডাকসাইটে মহিলা, ঝি বলে

মনেই হয় না। তবে সে খুব কাজের লোক। তাকে হুকুম দিয়ে কাজ করানো যায় না, কিন্তু নিজে থেকে সে যখনকার যা কাজ তা নিখুঁতভাবে করে।

বাড়িতে এতগুলো কাজের লোক থাকলেও হাবুলকে নিজের সব কাজ নিজেকেই করে নিতে হয়। দাদুর সেইরকমই আদেশ আছে। সে নিজের জামাকাপড় নিজে কাচে, নিজের জুতো নিজেই বুরুশ করে, নিজের ঘরখানাও তাকেই ঝাড়পোঁছ করতে হয়, নিজের এঁটো থালাও মাজতে হয়। দাদু বলেন, "দেখ হাবুল, এ-দেশটা গরিব বলে আমরা কাজের লোক রাখতে পারি। কিন্তু দেশটা যদি উন্নত হত, তা হলে কম পয়সায় কাজের লোক রাখা সম্ভব হত না। সব কাজ নিজেকেই করতে হত। একদিন যখন দেশটার ভোল পাল্টাবে, তখন তো কাজের লোকের অভাবে তোরা অথই জলে পড়বি। তার চেয়ে অভ্যাস রাখা ভাল। আর নিজের কাজ নিজে করলে আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায়।"

গরমের দুপুরে হাবুলের এখন খুব জলতেষ্টা পেয়েছে। কুঁজোর জল একটু আগেই শেষ হয়ে গেছে। বাগানের এক কোণে একটা টিউবওয়েল আছে, তার জল ভারী মিষ্টি আর ঠাণ্ডা। অঙ্কটা মেলানোর পর জল আনতে যাবে বলে ভেবেছিল হাবুল। কিন্তু কুকুরটা একনাগাড়ে ডেকে যাচ্ছে আর ঘনঘন শিকলের শব্দ করছে। কে এল একবার দেখা দরকার। তাই হাবুল উঠল।

কিন্তু উঠতে মনে পড়ল দাদু বলে দিয়েছেন, "হাতের কাজ শেষ না করে কিছুতেই অন্য কাজে যাবে ন। শত কষ্ট হলেও না।"

হাবুল ফের বসে পড়ল। অঙ্কটা কেটে দিয়ে আবার নতুন সাদা পাতায় শুরু করল। এবার দু'মিনিটেই মিলে গেল অঙ্কটা।

কুঁজো নিয়ে হাবুল বেরিয়ে এল। বাইরে ঝাঁঝাঁ রোদ। আকাশে এতটুকু মেঘ নেই। হাওয়া বইছে না। চারদিক থমথম করছে। বারান্দায় শিকলে বাঁধা কুকুরটা প্রচণ্ড লাফালাফি করছে। হাবুলকে দেখে কুকুরটা উৎসাহ পেয়ে আরও চেঁচাতে লাগল। হাবুল একটা ধমক দিতেই কুকুরটা চুপ করে বসে জিব বের করে হ্যাহ্যা হাঁফাতে থাকে।

ফটকের বাইরে একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। বেশ মলিন পোশাক, ক্লান্ত চেহারা। কুঁজোটা বারান্দায় রেখে হাবুল এগিয়ে গেল।

"কাকে চাইছেন?"

ছেলেটা অবাক হয়ে বাড়িটা দেখছিল। কিছুক্ষণ জবাব দিল না। তারপর একটা ময়লা রুমালে মুখ মুছে বলল, "রতন বাড়ুঁজ্যের বাড়ি কি এইটে?"

"হ্যাঁ। আমার দাদু।"

"আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

দাদু দুপুরে ঘুমোন না বটে, কিন্তু নিজের ঘরে বসে বিশ্রাম করেন। এ-সময়টা অনেক পুঁথিপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করা তাঁর অভ্যাস। দুপুরে তাঁকে ডাকাডাকি করা বারণ।

হাবুল বলল, "দাদুর সঙ্গে এখন তো দেখা হবে না। বিকেল চারটের পর তিনি ঘর থেকে বেরোবেন।"

ছেলেটা হাবুলের দিকে করুণ চোখে চেয়ে বলল, "আমি অনেক দূর থেকে আসছি। খুব ক্লান্ত। আমাকে একটু বসতে দেবে কোথাও? ওই বারান্দায় বসলে কোনও অসুবিধে আছে?"

হাবুল বলল, "হ্যাঁ, বারান্দায় কেন, বাইরের ঘরেও বসতে পারেন। কোনও অসুবিধে নেই। আসুন।"

ছেলেটা ফটক খুলে ভিতরে এল। তারপর হাবুলের পিছু-পিছু এসে বারান্দায় উঠে চারদিকটা চেয়ে দেখতে লাগল। কুকুরটা রাগে ঘড়ড় ঘড়ড় শব্দ করছে, কিন্তু হাবুলের ভয়ে চেঁচাচ্ছে না।

লোকটা ঘরে ঢুকল না। পিঠের ব্যাগটা নামিয়ে রেখে বারান্দার একটা কাঠের চেয়ারে বসে ক্লান্তির দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

হাবুল কুঁজো নিয়ে বাগানের টিউবওয়েল থেকে জল আনতে গেল। মিনিট দশেক বাদে ফিরে এসে সে দৃশ্য দেখে অবাক। ছেলেটা তাদের কুকুরটার কাছে গিয়ে উবু হয়ে বসেছে, আর গলায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। তাদের কুকুর টমি নির্লজ্জ বেহায়ার মতো চিৎপাত হয়ে শুয়ে চার ঠ্যাং নুলো করে আদর খাচ্ছে।

ডবারম্যান এমনিতেই খুনি কুকুর। দারুণ তেজ, ভয়ংকর সাহস। পাহারাদার কুকুর হিসেবে ডবারম্যান বিপজ্জনকও বটে। তাই টমি এত সহজে এরকম আনকোরা এক আগন্তুকের বশ মেনেছে দেখে হাবুল প্রথমটায় নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না।

ছেলেটা হাবুলের দিকে চেয়ে মৃদু হেসে বলল, "আমাদের বাড়িতে অনেক কুকুর ছিল। আমি কুকুরদের একটু-একটু বশ করতে পারি।"

হাবুলের বিস্ময় তবু কাটেনি। সে বলল, "কিন্তু টমি আজ অবধি কোনও অচেনা লোককে সহ্য করেনি।"

ছেলেটা উদাস স্বরে বলল, "অধিকাংশ লোকই কুকুরকে অকারণে ভয় পায়। কুকুরদের স্বভাব জানা থাকলে ভয়ের কিছু নেই। আমি তো গ্রামে-গঞ্জে কত কুকুরের পাল্লায় পড়েছি।"

"তাই নাকি?"

ছেলেটা উদাস মুখে বলল, "শুধু কুকুর? নেকড়ে বাঘ, সাপ, বুনো হাতি, খ্যাপা শেয়াল, ডাকাত, বাটপাড়, চোর, জীবজন্তুদের স্বভাব আমার জানা, তাই তাদের নিয়ে অসুবিধে হয় না। অসুবিধে পাজি মানুষকে নিয়ে।"

গল্পের গন্ধ পেয়ে হাবুল কুঁজোটা রেখে একটা কাঠের চেয়ারে ধপ করে বসে পড়ে বলল, "সত্যি? বলুন তো আপনার অভিজ্ঞতার কথা, একটু শুনি।"

"শুনবে? আচ্ছা বলব'খন। তোমাদের বাগানে ওই যে জামগাছটায় অনেক জাম ফলে আছে, আমি কয়েকটা পেড়ে খাব?"

হাবুল তাড়াতাড়ি উঠে বলে, "হ্যাঁ হ্যা, নিশ্চয়ই। দাঁড়ান, আমি লগি দিয়ে পেড়ে দিচ্ছি।"

ছেলেটা মাথা নেড়ে বলল, "লগি দিয়ে পাড়লে পাকা জাম থেঁতলে যায়। দরকার নেই, আমি চমৎকার গাছ বাইতে পারি। এইভাবেই তো আমাকে বেঁচে থাকতে হয়।"

এই বলে ছেলেটা বানরের মতো তরতর করে উঁচু গাছটায় চোখের পলকে উঠে গেল। চার-পাঁচ মিনিট বাদেই প্রায় মগডাল থেকে এক থোকা পাকা জাম নিয়ে নেমে এল।

হাবুল নিজেও এত ভাল গাছ বাইতে পারে না। সুতরাং ছেলেটার ওপর তার বেশ শ্রদ্ধা হল।

ছেলেটা এসে পাশের চেয়ারে বসে একটা জাম মুখে ফেলে থোকাটা তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "খাও।"

"আপনি খান। আমার জাম খেতে-খেতে অরুচি।"

"বেশ জাম।" বলে ছেলেটা ক্ষুধার্তের মতো খেতে লাগল।

হাবুল হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, "আপনি আমার দাদুর কাছে কেন এসেছেন?"

ছেলেটা জাম খেয়ে বিচিগুলো বাঁ হাতের তেলোয় জমা করছিল। অর্থাৎ সহবত জানে। অন্য কেউ হলে বিচিটা মুখ থেকেই ফুঃ করে ছুঁড়ে দিত বারান্দার বাইরে। একসঙ্গে গোটা তিনেক বিচি মুখ থেক বের করে ছেলেটা তার দিকে চেয়ে বলল, "কেন যে এসেছি, তা আমিই জানি না। তবে আমার দাদু মরার সময় আমাকে বলেছিলেন, বিপদে পড়লে রতন বাঁড়ুজ্যের কাছে যাস।"

কিছু মানুষ আছে, যাদের দেখলেই কেমন যেন ভাল লাগে, তাদের কাছে দু'দণ্ড বসে থাকতে ইচ্ছে হয়। হাবুলের কাছে তেমন মানুষ একজন হল দাদু। আর একজন ছিলেন স্কুলের ইতিহাসের স্যার পরিতোষবাবু। গত বছর পরিতোষবাবু মারা যান ডাকাতের গুলিতে। পাশের বাড়িতে ডাকাত পড়েছিল, পরিতোষবাবু গিয়েছিলেন তাদের বাঁচাতে। তৃতীয় আর একজন হল এই ছেলেটি। একে দেখেই হাবুলের বেশ ভাল লাগছে। চেহারাখানা যেমন ভাল, ব্যবহারটি তেমনি মিষ্টি।

হাবুল বলল, "দাদু ছাড়া আপনার আর কে আছে?"

"দাদু নেই, কেউ নেই। আমি একদম একা।"

কথাটা এমন উদাস নিস্পৃহ গলায় বলল যে, হাবুলের বুকের মধ্যে কষ্ট হল একটু। সে বলল, "আপনি বসুন, আমি বরং দাদুকে ডেকে আনি।"

ছেলেটা মাথা নেড়ে বলল, "তাড়া নেই। আমি বসছি। উনি বিশ্রাম করছেন করুন।"

"আচ্ছা।" বলে হাবুল ঘরে চলে এল। কিন্তু আর লেখাপড়ায় তেমন মন বসল না।

॥ তিন ॥

ঠিক চারটের সময় দাদুর ঘরের দরজা খুট করে খুলে যেতেই হাবুল গিয়ে হাজির। "দাদু, তোমার সঙ্গে একজন দেখা করতে এসেছে।"

"কে? কী নাম?"

"জিজ্ঞেস করিনি। একটা ছেলে।"

দাদু একটু ভ্রূ কুঁচকে বললেন, "অচেনা কেউ এলে আগে তার নাম-পরিচয় জেনে নিবি তো? বসিয়েছিস?"

"হ্যাঁ। বারান্দায়।"

"এই রোদ্দুরে বারান্দায়?"

"এল না যে ভিতরে।"

দাদু আর বাক্যব্যয় না করে খড়মের শব্দ তুলে বারান্দায় এলেন। মুখখানা গম্ভীর, একটু অপ্রসন্ন।

ছেলেটা চেয়ারে বসে ঢুলছিল। দেখেই বোঝা যায়, ভীষণ ক্লান্ত। দাদু কিছুক্ষণ নীরবে ছেলেটিকে লক্ষ করলেন। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, "মনে হচ্ছে রামদুলালের নাতি।"

হাবুল বলল, "রামদুলাল কে দাদু?"।

দাদুর মুখচোখ হঠাৎ খুব ফ্যাকাসে দেখাচ্ছিল। চোখের দৃষ্টি যেন বহু দূরে চলে গেছে। কিছুক্ষণ চুপ করে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছেলেটির দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর দূরের দিকে।

হাবুল আর কিছু জিজ্ঞেস করতে ভরসা পেল না।

দাদু পিছু ফিরে ঘরের দিকে রওনা দিতে দিতে তাকে বললেন, "ও ঘুমোচ্ছে, ঘুমোক। অনেকটা রাস্তা আসতে হয়েছে। জাগলে পরে আমার ঘরে নিয়ে আসিস।তোর মা'কে বল ভাল করে জলখাবার বানাতে। আর বেণুকে ডেকে উত্তরের ঘরখানা সাফ করে রাখতে বলে দে। ভাল করে যেন বিছানা পেতে রাখে।"

হাবুল মাথা নেড়ে বলল, "আচ্ছা।"

দাদু ধীর পায়ে, অনেকটা যেন নিজের শরীরের ভার টানতে টানতে, ঘরে ফিরে গেলেন।

দাদুকে এত অন্যমনস্ক আর বিষণ্ণ হতে আর কখনও দেখেনি হাবুল। তার চেয়েও বড় কথা, দাদুর চোখে একটু ভয়ের আভাসও দেখতে পেয়েছে সে। রতন বাঁড়ুজ্যে সম্পর্কে যে যাই বলুক, এটা সবাই জানে, এরকম ডাকাবুকো লোক এ-তল্লাটে আর নেই। সেই দাদুর চোখে একটা চাপা আতঙ্কের ছাপ দেখে হাবুল খুব অবাক হল। একটা অচেনা ছেলে—রামদুলাল না কার নাতি—তাকে দেখে এতটা ঘাবড়ে যাওয়ার কী আছে?

হাবুল গিয়ে মাকে জলখাবারের কথা আর বেণুকে ঘর সাজানোর কথা বলে বারান্দায় ফিরে এল। এসে দেখে, ছেলেটা সোজা হয়ে বসে জামগাছে বসে থাকা একটা ঘুঘুপাখির দিকে চেয়ে আছে।

হাবুল বলল, "শুনছেন? দাদু আপনার জন্যে বসে আছেন।"

ছেলেটা কথাটা কানে তুলল না। হাবুলের দিকে চেয়ে বলল,“তুমি কখনও ঘুঘুপাখির মাংস খেয়েছ?

“না। কেন?”

ছেলেটা মাথা নেড়ে বলল, “না, এমনি জিজ্ঞেস করলাম। গত কয়েক মাসে আমাকে অনেকরকম খাবার খেয়ে বেঁচে থাকতে হয়েছে। পুরুলিয়ার জঙ্গলে একবার একটা ঘুঘুকে পুড়িয়ে খেতে হয়েছিল। জীবজন্তু পাখি এসব মারতে আমার ভীষণ কষ্ট হয়। কিন্তু সেই ঘুঘুটাকে না মারলে আমি খিদের জ্বালায় বোধহয় মরেই যেতাম।”

এই বলে রামদুলালের নাতি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর হাবুলের দিকে একটু রহস্যময় চোখে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলল, “আমাকে দেখে তোমার দাদু বোধহয় খুশি হননি, না?”

হাবুল অবাক হয়ে বলে, “দাদু যে আপনাকে দেখেছেন তা জানলেন কী করে? আপনি তো বসে ঢুলছিলেন?”

“আমি কখনও পুরোপুরি ঘুমোই না। ঘুমোলেই বিপদ। তাই সবসময়ে আমার ভিতরে একজন জেগে থাকে। পাহারা দেয়।”

বলে ছেলেটা উঠে দাঁড়াল।

হাবুল তাকে দাদুর ঘর অবধি পৌঁছে দিল। দাদু ইজিচেয়ারে বসে ছিলেন। উঠে এসে ছেলেটাকে হাতে ধরে ঘরে গিয়ে কপাট বন্ধ করে দেওয়ার আগে হাবুলকে বললেন, “আধঘন্টা যেন কেউ আমাদের বিরক্ত না করে।”

হাবুল শুনেছে তার দাদু রতন বন্দ্যোপাধ্যায় একসময়ে খুবই গরিব ছিলেন। তাঁর বাবা ছিলেন পুরোহিত। তিনিও ওই বৃত্তিতেই দিন গুজরান করতেন কোনও রকমে। একবার গাঁয়ে খুব আকাল দেখা দিল। খরায় সেবার গাছপালা মরে গেল, মাটি শুকিয়ে হয়ে গেল ঝুরঝুরে। কুয়ো শুকোল, পুকুর শুকোল, এক ফোঁটা খাওয়ার জল পর্যন্ত জোটে না। রতন বাঁড়ুজ্যে তখন সপরিবারে বেরিয়ে পড়লেন হারা-উদ্দেশে। গিয়ে ঠেকলেন সাঁওতাল পরগনায়।শোনা যায় সেখানে ভাগ্যক্রমে তিনি এক ধনী লোকের আশ্রয় লাভ করেন। আর তারপরেই তাঁর কপাল ফিরে যায়।

কিন্তু দাদুর এই ভাগ্য পরিবর্তন সম্পর্কেও অনেক কুলোকে কুকথা বলে। কেউ বলে, দাদু নাকি লোকটাকে খুন করে সম্পত্তি হাতিয়ে নেন। কেউ বলে, উনি চুরি করে পালান।

সত্যিকারের কী ঘটেছিল, তা কেউ জানে না। একমাত্র পাঁচুদা হয়তো বা কিছু জানতে পারে। কিন্তু তার মুখ থেকে কোনওদিনই কিছু বেরোবে না।

হাবুল লক্ষ করল, রান্নাঘরে সুখনের মা ময়দা ঠাসছে।

বেণু উনুনে গুঁড়ো কয়লার টিমে আঁচ চেতিয়ে তুলছে ভাঙা লটপটে একটা হাতপাখার বাতাসে। বেণুর সঙ্গে সুখনের মায়ের একটুও বনে না। দু’জনে এক জায়গায় হলেই ঝগড়া লাগে। আজও হচ্ছিল।

সুখনের মা বলছিল, “এই যে নবাবনন্দন, সব-কিছু খুব সিধে দেখেছ না? চৌপর দিন তো গুলতি নিয়ে কাক-বক শিকার করে বেড়াও আর বাগানের জাম জামরুল আম আতা পেড়ে-পেড়ে পেটে পোরো, সব জানি, বলি, তোমাকে কি শুধু টেরি বাগানের জন্য রাখা হয়েছে?”

বেণু বেজায় ধোঁয়া তুলে লকলকে আগুনের শিখা বের করে ফেলতে ফেলতে বলল, "মাসি, তোমার মতো কি আর আমাদের কপাল? তোমার কপালের নাম হল সাক্ষাৎ গোপাল, বাপের বাড়ির ঝি, তার পান্তাভাতে ঘি। সুখে থেকে-থেকে তেল-চুকচুকে চেহারাখান হয়েছে বটে, কিন্তু মাসি, আমার ওপর তোমার অত নেকনজর কেন? বেশি কটর কটর করবে তো ফের সেদিনের মতো বালিশের তলায় জ্যান্ত ব্যাঙ চাপা দিয়ে রেখে আসব।"

হাবুল রান্নাঘরের দিক থেকে সরে এল।

উত্তরের ঘরখানা বেশ ভাল, তবে এ ঘরে কেউ থাকে না। দাদুর একখানা পুরনো ভারী সিন্দুক আছে, একটা বিলিতি লোহার ভারী ও প্রকাণ্ড আলমারি, আর অনেক কাগজপত্রের ডাঁই, কিন্তু ঘরখানার জানালা-দরজা খুলে দিলে ভারী আলো-ঝকমকে, আর হাওয়ায় ভরা হয়ে যায়। একধারে বাগানের দোলনচাঁপা গাছগুলো থাকায় বর্ষাকালে চমৎকার গন্ধ আসবে।

হাবুল দেখল, উত্তরের ঘরে পুরনো আমলের খাটখানার ধুলো ঝেড়ে তাতে পরিপাটি বিছানা করছে, পাঁচুদা।

হাবুল ঘরে ঢুকে জিজ্ঞেস করল, "ছেলেটা কে গো পাঁচুদা?"

পাঁচু মুখটা একটু বিকৃত করে বলল, "কে জানে দাদা? কখনও দেখিনি।"

হাবুল বলল, "দাদুও দেখেনি, কিন্তু দাদু ওকে চেনে।"

"তোমার দাদু মেলা লোককে চেনে। আর চিনেই হয়েছে ফ্যাসাদ। বেশি চেনা ভাল নয়।"

"ছেলেটা বোধহয় কোনও ভি.আই.পি.হবে, তাই না? যা খাতির যত্ন করা হচ্ছে..."

পাঁচু বিছানার চাদরটা নিখুঁত করে পেতে ভাল করে গুঁজে দিতে দিতে বলল, "পাঁটাকেও বলি দেওয়ার আগে খুব করে খাওয়ানো হয়, গলায় ঘি মালিশ করা হয়, মালা পরানো হয়। তাতে কী হল?"

হাবুল তুলনাটার অর্থ না বুঝে বলল, "তার মানে? ছেলেটাকে কি বলির পাঁটা বলে মনে হচ্ছে?"

বেজার মুখ করে পাঁচু বলে, "তা বলিনি, বরং উল্টোটাই। দেখে শুনে তো মনে হচ্ছে বলির পাঁটা আমরাই, উনি দু'দিনের জন্য উড়ে এসে জুড়ে বসলেন।"

এ রকম ব্যাখ্যায় হাবুল খুশি না হয়ে বলল, "তুমি তাহলে ছেলেটাকে চেনো!"

"না দাদা, কস্মিনকালেও চিনতাম না।"

"তবে কী করে বুঝলে যে, উড়ে এসে বসেছে? ছেলেটাকে দেখে দাদু অবধি কী রকম ঘাবড়ে গিয়েছিল জানো?"

এ-কথায় কে জানে কেন পাঁচু হঠাৎ রেগে উঠল। দুখানা চোখ ঝলসে উঠল হঠাৎ। হাবুলের দিকে চেয়ে ঝাঁঝের গলায় বলল, "কাজের সময় অত বগবগ করবে না তো? যাও, নিজের কাজে যাও।"

হাবুল যে পাঁচুকে ভয় পায় এমন নয়। আসলে দাদু তাকে কোনও কিছুতে ভয় না-পেতেই শিখিয়েছেন। হাবুলের ভূতের ভয় নেই, অন্ধকারকে ভয় নেই, চোর ডাকাত পাগল কাউকে ভয় নেই। রাগী লোকদের সে খামোখা চটায় না বটে, তা বলে ভয়ও পায় না।

ছেলেটা সম্পর্কে কোনও খবরই যে সহজে পাওয়া যাবে না এটা আঁচ করে নিল হাবুল।

বিকেল হয়ে এসেছে বলে সে আর দেরি না করে ফুটবল খেলার বুটজোড়া আর শর্টস ও গেঞ্জির কিটব্যাগটা নিয়ে মাঠে রওনা হল।

তাদের ফটক থেকে বেরিয়ে ডানহাতে কিছুটা গেলেই প্রকাণ্ড খেলার মাঠ। এখনও সবাই আসেনি, দু-চারজন বল-পেটাপেটি করছে। হাবুল পোশাক আর বুট পরে মাঠে নেমে গেল।

॥ চার ॥

বিকেলের আলো মরে এলে আমবাগানের ঈশেন কোণে গুটিগুটি ষষ্ঠী এসে দাঁড়িয়ে চোরা চোখে ইতিউতি চাইতে লাগল। বুকটা একটু ঢিবঢিব করছে। আংটির পাথরটা যদি হিরেই হয়, তা হলে যষ্ঠীকে আর ইহজন্মে ছ্যাঁচড়ামি করে বেঁচে থাকতে হবে না। হিরে হলে কালী স্যাকরার কাছ থেকে মোটা টাকা আদায় করে সে একটা বন্দুক কিনে ফেলবে, তারপর স্যাঙাত জুটিয়ে তৈরি করবে একটা ডাকাতের দল। ছোটখাটো কাজ আর নয়।

একটা গাছের গুঁড়ির আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে ষষ্ঠী মশা তাড়াতে তাড়াতে ডাকাত হওয়ার কথা ভাবছিল, ভাবতেই কেমন যেন একটা শিহরণ জাগে শরীরে। এই অঞ্চলেই এক সময় বুক ফুলিয়ে ডাকাতি করে বেড়াত পানু মণ্ডল। যেমন বিশাল চেহারা, তেমনি তার দাপট। এখন বুড়ো বয়সে আর নিজে কিছু করে না, কিন্তু হাঁকডাকে এখনও বাঘে-গোরুতে এক ঘাটে জল খায়। তারই শিষ্য চিতে দাস হচ্ছে এখন সর্দার। তার দাপটও কিছু কম নয়, তবে লোকটা মিটমিটে ডান, হাঁকডাক করে না, কিন্তু দারুণ বুদ্ধি রাখে। বুদ্ধি ষষ্ঠীরও কিছু কম নেই, তবে কিনা হাভাতেকে আর কে পোঁছে? একবার চিতে দাসের দলে ঢুকতে গিয়েছিল, ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বারদুয়ার থেকেই বিদেয় করে দিয়েছে।

হিরেটা যদি খাঁটি হয়, তাহলে ষষ্ঠী বন্দুক কিনে ফেলছেই। তারপর দুমদাম দু'দশটা করে লাশ পড়তে থাকবে তার হাতে। হাজার-হাজার লাখ-লাখ টাকা লুটেপুটে নিয়ে আসবে চারদিক থেকে। গণেশ কাংকারিয়ার গদি সাফ করবে, বৈজু লালোয়ানির বাড়ির ঠাকুরঘর থেকে লুকোনো সোনা বের করবে, যতীন সামন্তর বন্ধকি কারবারে জমা হওয়া জিনিসপত্র সোনারুপো গোরুর গাড়িতে চাপিয়ে তুলে নিয়ে আসবে। শহরের দুটো ব্যাংকে ডাকাতি করলে মোটা টাকাই এসে যাবে হাতে। কয়েক লাখ টাকা হলে ষষ্ঠী তখন জুতো মসমসিয়ে নতুন লুঙ্গি পরে বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে বাজার থেকে রোজ ইলিশ মাছ আর কাটোয়ার ডাঁটা কিনে আনবে। ও দুটো খেতে সে খুব ভালবাসে। আর তেলেভাজা দিয়ে মুড়ি, রোজ খাবে। ভাবতে ভাবতে জিবে জল এসে গেল তার। উত্তেজনায় গাছের গুঁড়িতে একটা কিলও দিয়ে বসল।

কিন্তু ছেলেটা যে আসছে না। আসবে তো?

রতন বাঁড়ুজ্যে লোক বড় সুবিধের নয়। ছেলেটা যদি তার কাছে ষষ্ঠীর কথা সাতকাহন করে বলে থাকে, তবে তাকে চিনতে বুড়োর একলহমাও লাগবে না। তখন হয়তো ছেলেটাকে আসতে না দিয়ে নিজেই লাঠি বাগিয়ে এসে হাজির হবে।

ষষ্ঠী ভয়ে-ভয়ে চারদিকটা দেখে নিয়ে একটা ঝোপের আড়ালে আরও সরে দাঁড়াল।

অন্ধকারটা ক্রমে ক্রমে বেশ জমাট বেঁধে এল। মিটিমিটি জোনাকি জ্বলতে লেগেছে। আকাশে তারার পিদিম ফুটছে একটি-দুটি করে। ঘরে শাঁখ বাজতে লেগেছে।

ঠিক এরকম সময়টায় হঠাৎ কে যেন পিছন থেকে ষষ্ঠীর কাঁধে হাত রাখল।

ষষ্ঠী হঠাৎ চমকে উঠেই অভ্যাসবশে বলে ফেলল, "আমি না। সত্যি বলছি, আমি কিছু করিনি।"

কেউ ষষ্ঠীকে ধরলেই এই কথা বলা ষষ্ঠীর স্বভাব।

ছেলেটা মৃদু একটু হাসির শব্দ করে বলল, "কী করেননি কানাইবাবু?"

ষষ্ঠী লজ্জা পেয়ে জিব কেটে বলে, "কত পাজি লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে চারদিকে। চোর গুণ্ডা পকেটমারের অভাব নেই। আমি কারও সাতে-পাঁচে থাকি না তো, তাই কেউ ধরলেই আগে সাফাইটা গেয়ে রাখি। এই তো সেদিন ভুষ্‌নো-চোর পণ্ডিতবাড়ির খুকিটার নাকের নথ চুরি করল, আর মেধো পণ্ডিতের ছেলে রেমো এসে আমার ওপর কী চোটপাট! কলিকালটা খুব জেঁকে পড়েছে মশাই।"

"তা বটে। এবার তা হলে চলুন, আংটিটার একটা ব্যবস্থা করা যাক্।"

ষষ্ঠীর বুকটা খুব ঢিবঢিব করতে লেগেছে। যদি হিরে হয়? ওঃ, যদি হিরেই হয়? তা হলে আর তাকে পায় কে!

কালী স্যাকরার দোকান বাজারের মধ্যিখানে হলেও বেশ নিরিবিলি। খদ্দের বিশেষ আসে না। কালী স্যাকরার খদ্দেররা আসে নিশুত রাতে। চোরাই সোনা কেনাবেচা করে বলে তার সুনাম আছে। সুতরাং ভদ্রলোক খদ্দের তার নেই। তার চেহারাটা বেশ গোলগাল, ব্যবহার ভারী অমায়িক।

আংটি ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে অনেকক্ষণ দেখল কালী। কষ্টিপাথরে ঘষল। এক চোখে একটা ঠুলি পরে নিয়ে পাথরটা পরখ করল। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "পাথরটা আজ্ঞে পোখরাজই বটে। শ' দুই টাকা দাম হবে এই বাজারে। আর সোনায় বলতে নেই মেলা পান। বাদসাদ দিলে সব মিলিয়ে মেরে-কেটে শ' চারেক টাকা দাম হয়। তা আপনি বিপদে পড়ে এসেছেন বলে ষষ্ঠী বলছিল, আমি নাহয় থোক সাড়ে চারশোই দিচ্ছি। আমার পঞ্চাশ টাকাও লাভ থাকবে কি না সন্দেহ।"

ছেলেটা আংটিটা কিছুক্ষণ মুঠোয় চেপে চোখ বুজে বসে রইল। বংশগত জিনিস হাতছাড়া করতে মনে কষ্ট হচ্ছে বলে ভাবল ষষ্ঠী। মুখে কিছু বলল না।

খানিকক্ষণ পর চোখ খুলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ছেলেটা আংটি কালী স্যাকরার হাতে দিয়ে বলল, "তাই দিন তা হলে। আমার বড় বিপদ।"

কালী স্যাকরা খুব সহানুভূতির সঙ্গে বলল, "তা আর বলতে। দাম যাই হোক, পুরনো জিনিসের মায়াই কি কম? বিপদে না পড়লে কেউ কি হাতছাড়া করে?"

কালী আংটিটা লোহার সিন্দুকে রেখে সাড়ে চারশো টাকা গুনে গুনে ছেলেটার হাতে তুলে দিল।

জুলজুলে চোখে ষষ্ঠী পুরো ব্যাপারটা দেখল। বুকটা খুব ঢিবঢিব করছে। কালী স্যাকরার চোখে আলোর ঝলকানি দেখেই সে বুঝে নিয়েছে, আংটিটা ফঙ্গবেনে জিনিস নয়।

ছেলেটা টাকা নিয়ে গায়েব হয়ে যাওয়ার পর ষষ্ঠী একটা বিড়ি ধরিয়ে কালী স্যাকরার দিকে চেয়ে চোখ একটু মটকে বলল, "কী? বলেছিলুম না খুব দাঁও পেয়েছি একটা?"

কালী মুখটা গম্ভীর করে বলল, "দ্যাখ্ ষষ্ঠী, পাঁচকান করলে কিন্তু বিপদ ঘটবে। তোর তো আবার পেটে কথা থাকে না।"

ষষ্ঠী খুব গিলগিল করে হাসল। তারপর চাপা গলায় বলল, "দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করে আংটিটা আর-একবার বের করো তো, একটু দেখি।"

কালী স্যাকরা উঠে দোকানের দরজাটা সাবধানে বন্ধ করে খিল এঁটে দিল। তারপর লণ্ঠনের সলতেটা তেজালো করে সিন্দুক খুলে আংটিটা বের করে আনল।

"হা সর্বনাশ!"

ষষ্ঠী চমকে উঠে বলল, "হল কী?"

কালী স্যাকরা হাতের তেলোয় আংটিটার দিকে অবিশ্বাসের চোখে চেয়ে আছে, শ্বাস প্রায় বন্ধ, চোখ কপালে।

ষষ্ঠী ব্যস্ত হয়ে বলল, "বলি ও কালী, অমন পাথর হয়ে গেলে কেন?"

কালী বিবর্ণ মুখে ষষ্ঠীর দিকে চেয়ে বলল, "এ যে নিজের চোখকে বিশ্বেস হচ্ছে না রে। ওইটুকু ছেলের এমন হাতসাফাই?"

"করেছেটা কী?"

কালী নিস্তেজ গলায় বলল, "এ আংটি সে আংটি নয়।"

"তার মানে?"

"যেটা দেখিয়েছিল সেটায় ভরিটাক সোনা, আসল হিরে। আর এটা স্রেফ পেতল আর কাচ। তিন পয়সা দাম।"

"বলো কী?"

দুজনেই আহাম্মকের মতো হাঁ করে দুজনের দিকে চেয়ে রইল।

কিছুক্ষণ পরে সম্বিত ফিরে পেয়ে দাঁত কড়মড় করে ষষ্ঠী বলল, "আসল হিরেটার দাম কত বললা তো?"

কালী মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বলল, "কম করে ধরলেও লাখ টাকার কাছাকাছি। অত বড় হিরে আমি জন্মেও দেখিনি। আর জেল্লা কী।"

ষষ্ঠী নিজের উরুতে একটা চাপড় মেরে বলল, "বোকা বানিয়েছে! ঠিক আছে, আমিও দেখে নেব। ওই হিরে যদি বাগাতে না পারি তো আমার নাম ষষ্ঠী নয়।"

কালী স্যাকরা করুণ চোখে ষষ্ঠীর দিকে চেয়ে বলল, "তোর মনে শেষে এই ছিল রে? নিজের ভাইয়ের মতো তোকে ভালবাসতাম। শেষে কিনা একটা জোচ্চোরকে জুটিয়ে এনে আমার সর্বনাশ করলি?"

ষষ্ঠী দাঁত-কড়মড় করে বলল, "তোমার সঙ্গে বেইমানি করলে আমার ধর্মে সইবে কালীদা? কোন্ দেবতার নামে দিব্যি করতে হবে বলো, করছি। ছোঁড়াটার সঙ্গে আজই চেনা হল। কিন্তু ও যে এত বড় ধুরন্ধর, তা মুখ দেখে বুঝতে পারিনি। তবে এই বলে রাখলাম, যেমন করেই হোক ও আংটি আমি উদ্ধার করে আনবই।"

কালী স্যাকরা মাথায় হাত দিয়ে বসে বলল, "পারবি? ছোঁড়া যে এলেম দেখিয়ে গেল, তাতে কাজটা সহজ হবে বলে মনে হয় না। খুব সাবধান।"

কথাটা ষষ্ঠীও হাড়ে-হাড়ে জানে যে, ছোকরার কাছ থেকে আসল আংটি বের করে আনা যার-তার কর্ম নয়। কিন্তু রাগের মাথায় মানুষের কত কী মনে হয়, হেন করেঙ্গা, তেন করেঙ্গা।

কালী স্যাকরার দোকান থেকে বেরিয়ে এসে ষষ্ঠী গনগন করতে করতে খানিক দূর হাঁটল। এসপার-ওসপার একটা কিছু করতেই হবে আজ। কী করবে তাও সে খানিকটা আঁচ করে নিল। আজ রাতে সে রতন বাঁড়ুজ্যের বাড়ি হানা দেবে। একটা খুনে কুকুর আছে ওবাড়িতে। তা থাক। ষষ্ঠী বিষ মাখানো মাংসের টুকরো নিয়ে যাবে। কুকুরকে নিকেশ করে ছোকরাটাকে ঘুমের ওষুধ স্প্রে করে ঘুম পাড়াবে। এই দুই কর্ম জানালার বাইরে থেকেই করে নেওয়া যাবে। কাজগুলো হয়ে গেলে ঘরে ঢোকা জলবৎ তরলং। তারপরেও যদি কেউ বাধা দেয় তো ষষ্ঠীর ছোরা আছে, বাঘনখ আছে, ব্লেড আছে। অবশ্য আজ অবধি খুন দূরে থাক, ষষ্ঠী কাউকে তেমন জখমও করেনি। কিন্তু আজ করেই ফেলবে একটা এসপার-ওসপার।

মেছোবাজারের কাছে কে যেন পিছন থেকে ডাকল, "ওরে ষষ্ঠী! কোথায় চললি অমন মেলট্রেনের মতো?"

ষষ্ঠী ফিরে দেখল, টিকে গুণ্ডা। দশাসই চেহারা। পরনে লুঙ্গি, গায়ে ফিনফিনে স্যাণ্ডো গেঞ্জি, ইয়া গোঁফ, বাবরি চুল, গলায় সোনার চেন-ও একখানা ধুকধুকি ঝুলছে। টিকে গুণ্ডা খুবই তালেবর লোক ছিল একসময়ে। বাজারে তার মাংসের দোকান। তবে এখন আর তত দাপট নেই। শোনা যায় যে, টিকে গুণ্ডা টাকা নিয়ে খুন-টুন করে।

তাকে দেখে ষষ্ঠীর মাথায় চড়াক করে বুদ্ধি খেলে গেল।ছোকরাটাকে জব্দ করতে হলে টিকে গুণ্ডার চেয়ে উপযুক্ত লোক আর কে আছে?

ষষ্ঠী খুব কাঁচুমাচু মুখ করে বলল, "টিকেদা, খুব ঠেকায় পড়ে গেছি। একটু উদ্ধার করে দিতে পারবে?"

টিকে সন্দিহান চোখে চেয়ে বলল, "টাকা ধার চাইবি নাকি? ওসব হবে না।"

ষষ্ঠী বুক ফুলিয়ে বলল, "আরে না না। ধার চাইব কেন, বরং তোমাকে কিছু পাইয়ে দেবখন। তবে কাজের পর।"

টিকে চোখ দুটো ছোট করে বলল, "তুই কাজ করিয়ে আমাকে টাকা দিবি? বলিস কী রে? লটারি পেয়েছিস নাকি? না মাথাটা বিগড়েছে?"

ষষ্ঠী গম্ভীর হয়ে বলল, "মাথাও বিগড়ায়নি, লটারিও পাইনি। তবে একটা ব্যাপার ঘটেছে। একটা তে-এঁটে ছোকরাকে সাফ করে দিতে হবে।"

টিকে চোখ আরও ছোট করে বলল, "বটে! তুই আমাকে টাকা খাইয়ে খুন করাতে চাস? বাঃ, তোর এলেম তো দিব্যি বেড়েছে রে ষষ্ঠী! তা ছেলেটা কে?"

"যদি রাজি থাকো তো বলো। বেশি বকবক কোরো না।"

টিকে অনেকক্ষণ ঠাণ্ডা চোখে ষষ্ঠীকে দেখে নিয়ে বলল, "কত টাকা দিবি শুনি?"

"দু'পঁচশো যা হোক দেব। তুমি ঠকবে না।"

টিকে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, "ঠিক আছে, না হয় রাজিই হলুম, এবার বল তোছোকরাটা কে আর তাকে খুনই বা করতে চাইছিস কেন?"

ষষ্ঠী একটু সাবধান হল। আসল বৃত্তান্ত জানতে পারলে টিকে নিজেই লাখ টাকার আংটিটা গাপ করবে। তাই সে গলা-খাঁকারি দিয়ে বলল, "দ্যাখো বাপু, অত খতেন নিলে কাজ তোমাকে করতে হবে না। যদি রাজি থাকো তো রাত বারোটার পর আমবাগানের ঈশেন কোণে হাজির থেকো। আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাব।"

"কোথায় নিয়ে যাবি?"

"একটা বাড়িতে। তবে কার বাড়ি তা এখন বলব না।"

"তারপর কী হবে?"

ষষ্ঠী মাথা চুলকে বলল, "তারপর কাজ খুব কঠিন নয়। বাইরে থেকে দরজা খুলে দুজনে ভিতরে ঢুকব। যাকে খুন করতে হবে, তাকেও আগে থেকে ঘুম পাড়িয়ে দেব। তোমাকে তেমন মেহনত করতে হবে না।"

টিকে মাথা নেড়ে বলল, "আমি তেমন কাপুরুষ খুনিয়া নই রে যে, ঘুমন্ত মানুষকে খুন করব। খুন করতে হয় তো বাপের ব্যাটার মতো মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জলজ্যান্ত মানুষকেই করব।"।

ষষ্ঠী তাড়াতাড়ি টিকের পথ আটকে দাঁড়িয়ে বলে, "সে তো ভাল কথা, কিন্তু তোমারও বলতে নেই বয়স কম হল না। গায়ে তোমার ষাঁড়ের মতো জোর আছে তাও সত্যি, কিন্তু এ-ছোকরার বয়সও কম, তেজও আছে।"

টিকে গুম মেরে থেকে বলল, "খুনের পর কী হবে?"

ষষ্ঠী বলল, "ব্যস, তারপর তুমিও কেটে পড়বে, আমিও কেটে পড়ব।"

"তোর আর কোনও মতলব নেই?"

"না। সত্যি বলছি, মা কালীর দিব্যি।"

টিকে হঠাৎ তার বিশাল থাবায় ক্যাঁক করে ষষ্ঠীর ঘাড় চেপে ধরে প্রায় শূন্যে তুলে ফেলে বলল, "পেট থেকে সত্যি কথাটা এইবেলা বের না করলে দুই ঝাঁকুনিতে তোর মগজের ঘিলু নাড়িয়ে দেব।"

ষষ্ঠী চিঁচিঁ করে বলল, "বলছি বলছি। ছাড়ো...আঃ, দম আটকে যাবে যে!"

টিকে তাকে ছেড়ে দিয়ে বলল, "এবার বল।"

ষষ্ঠী হাঁফাতে-হাঁফাতে বলল, "তার কাছে আমার একটা আংটি আছে। সেটা শুধু খুলে নেব আঙুল থেকে।"

টিকে খুব হাসল। তারপর ষষ্ঠীর পিঠে একটা বিরাশি সিক্কার চাপড় বসিয়ে বলল, "তোর মাথা আছে বটে। ঠিক আছে, থাকব আমবাগানের ঈশেন কোণে রাত বারোটায়। দেখা যাক তোর কেরামতি।"

॥ পাঁচ ॥

ছেলেটা আসার পর থেকেই যে দাদুর মন খারাপ হয়ে গেছে, সেটা বুঝতে পেরে হাবুলের মনটাও ভাল নেই। বিকেলে ফুটবলের মাঠে সে আজ খুবই খারাপ খেলল। দু' দুবার ওপেন নেট পেয়েও গোল করতে পারল না। ভুল পাস করল অজস্র। ড্রিবলিংও খুব খারাপ হল তার।

কোচ দয়ারাম দাস খেলার পর তাকে ডেকে বলল, "আর দুদিন বাদে প্রভাবতী শিল্ডের সেমিফাইন্যাল। মন দিয়ে না খেললে ফাইন্যালে যাওয়ার আশা নেই। যবনপুর খুব শক্ত টিম।"

হাবুল মাথা নিচু করে রইল।

বাড়ি এসে হাতমুখ ধুয়ে ছেলেটার খোঁজ করে জানল, সে বেরিয়ে গেছে।

হাবুল গিয়ে দাদুর কাছে দাঁড়াল।

"দাদু, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব?"

দাদু মধু আর সর দিয়ে মারা স্বর্ণসিন্দুর খাচ্ছিলেন। মুখ তুলে বললেন, "বলো।"

"ছেলেটা কে?"

দাদু একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, "নিয়তি।"

"নিয়তি! তার মানে?"

"মানে বোঝার মতো বয়স তোমার হয়নি। তবে এ-ছেলেটা আসায় তোমাদের সুখের দিন শেষ হয়ে গেল। দুঃখের জন্য তৈরি হও। তিলে-তিলে এতকাল ধরে যা তৈরি করেছিলাম, তার কিছুই বুঝি আর। থাকে না।"

হাবুল বেশি কিছু বুঝতে পারল না। তবে তার মনে হচ্ছিল, দাদু যতটা দুঃখ করছেন, তত কিছু সর্বনাশ তাদের হওয়ার কথা নয়। কিন্তু সে মুখে আর কিছু বলল না। হাতমুখ ধুয়ে আহ্নিক সেরে পড়তে বসল।

পড়ার ঘরে বসে থেকেই হাবুল টের পেল, তার বাবা-কাকারা একে একে কাজের জায়গা থেকে ফিরে এলেন। কিছুক্ষণ পরেই দাদু তাঁদের নিজের ঘরে ডেকে পাঠালেন।

ব্যাপারটা যে এত গুরুতর হয়ে দাঁড়াচ্ছে, সেটা হাবুলের একদমভাল লাগছিল না।

আজ পড়ায় হাবুলের মন নেই। বারবার আনমনা হয়ে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পর অসহ্য লাগায় সে উঠে পড়ল। তারপর সোজা গিয়ে ছেলেটার ঘরে হানা দিল।

ছেলেটা ফিরেছে, এবং একটা মাপবার ফিতে দিয়ে খুব মনোযোগ সহকারে জানালা থেকে খাট অবধি কী সব মাপজোখ করছে।

হাবুল বলল, "কী করছেন?"

ছেলেটা তার দিকে চেয়ে ভারী সুন্দর করে হেসে বলল, "রাতের অতিথিদের জন্য তৈরি থাকছি।"

“রাতের অতিথি মানে কি চোর? আমাদের বাড়িতে চোর আসে না। টমি আছে। তা ছাড়া দাদুকে এখানে সবাই খাতির করে আর ভয় পায়।”

ছেলেটা মাথা নেড়ে বলল, “আমি যদি চোর হতাম তবে এসব বাধা আমার কাছে বাধাই হত না।”

হাবুল বিরক্ত হয়ে বলল, “কিন্তু আপনি তো আর চোর নন। এখানকার চোরেরা আমাদের বাড়ি ঢুকবেই না।”

ছেলেটা মৃদু হেসে বলল, “আজ ঢুকতে পারে। এতদিন আসেনিবলেই কি আজ আসবে না? এসো, ভিতরে এসে বোসো। আলাপ করি।”

হাবুল সসঙ্কোচে ভিতরে ঢুকে চেয়ারে বসল। ঘরটা বেশ ঝকঝক করছে এখন।

ছেলেটা বিছানায় তার মুখোমুখি হয়ে বসে বলল, “তোমার নাম যে হাবুল তা জানি। আমার নাম হল গন্ধর্বকুমার। বিচ্ছিরি নাম, না?”

হাবুল হেসে বলল, “একটু পুরনো, কিন্তু বেশ ভারিক্কি।”

“আমাদের পরিবারে ভারিক্কি নাম রাখাটাই চল। তুমি আমাকে গেনুদা বলে ডেকো। আমার ডাকনাম গেনু। গন্ধর্বেরই সংক্ষিপ্ত সংস্করণ।”

ছেলেটাকে হাবুলের বেশ লাগছে। হাসিখুশি, আমুদে, উজ্জ্বল। তবু যে একে কেন দাদুর এত ভয়!

হাবুল বলল, “আচ্ছা, আমার দাদুর সঙ্গে আপনার কিসের সম্পর্ক বলুন তো!”

“আপনি নয়, তুমি। আমাকে ‘তুমি’ বলে ডাকলে খুশি হব।”

“ঠিক আছে। এবার জবাবটা দাও।”

গন্ধর্ব একটু অন্যমনস্ক হয়ে জানালার দিকে চেয়ে রইল। তারপর মাথা নেড়ে বলল, “সত্যি বলতে কি, তোমার দাদু যদি নিজে থেকে কিছু না বলেন, তা হলে আমারও জানার সাধ্য নেই তাঁর সঙ্গে আমার কিসের সম্পর্ক বা আমাকে দেখে তিনি এত ঘাবড়েই বা গেছেন কেন।”

“আপনি নিজে কিছু জানেন না?”

গন্ধর্ব মাথা নেড়ে বলল, “তেমন বিশেষ কিছু নয়। তবে এটুকু জানি যে, সাঁওতাল পরগনায় আমাদের কিছু জমিজমা ছিল, আর ছিল মস্ত এক কারবার। এখন আর কিছুই নেই। আমি কপর্দকশূন্য। আমার কিছু শত্রুও আছে। সেইসব নানা কারণেই আমাকে দেশ ছাড়তে হয়েছে। শুধু দাদুর মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিলাম। তারপরই বেরিয়ে পড়ি।”

“তোমার দাদু কি আমার দাদুর বন্ধু?”

“তা তোমার দাদুই বলতে পারবেন। আমি কিছুই জানি না। তবে আমার দাদু মারা যাওয়ার আগে আমাকে বলে গিয়েছিলেন যেন অবশ্যই রতন বাঁড়ুজ্যের সঙ্গে দেখা করি। সেইজন্যই আসা।”

“তোমার বাড়িতে আর কে আছে?”

গন্ধর্ব মাথা নেড়ে মলিন একটু হাসল। তারপর বলল, “কেউ নেই। বছর দশেক আগে আমাদের বাড়িতে একদল লোক চড়াও হয়ে সবাইকে মেরে ফেলে। শুধু দাদু কোনওক্রমে আমাকে নিয়ে পালিয়ে বেঁচে যান। তারপর থেকে আমি আর দাদু কেবল জঙ্গলে-জঙ্গলে ঘুরেছি, গাঁ-গঞ্জে মজুর খেটেছি, ভিক্ষে করেছি। বাড়িতে ফিরে যাওয়ার উপায় ছিল না।”

“কেন, উপায় ছিল না কেন?”

“কিছু লোক আমাদের ভয়ঙ্কর শত্রু। তারা এখনও সেখানে অপেক্ষা করে আছে। ফিরে গেলেই তাদের হাতে মরতে হবে। আমি দাদুকে প্রায়ই বলতাম, চলো দাদু, অন্য কোথাও গিয়ে নতুন করে জীবন শুরু করি। কিন্তু দাদু সে-কথায় আমল দিতেন না। দাদুর খুব ইচ্ছে ছিল নিজেদের বিষয়সম্পত্তি আবার উদ্ধার করবে। কিন্তু সেটা বোধহয় আর সম্ভব নয়।”

গন্ধর্বের কথা শুনে হাবুলের খুব কষ্ট হচ্ছিল। চোখ ছলছল করছিল তার। সে বলল, “তুমি খুব কষ্ট করেছ গেনুদা।”

“কষ্ট বলে কষ্ট! সাঙ্ঘাতিক কষ্ট। প্রত্যেকটা দিনই ছিল বেঁচে থাকার লড়াই। তবে সে-জীবনেরও একটা আনন্দ আছে। শিকার করে বা বনের ফলপাকুড় পেড়ে আমাদের খাওয়া চলত। গাছের ডালে বা মাটিতে শুয়ে কত রাত কেটে গেছে। সে-জীবন কীরকম তা তুমি ভাবতেও পারবে না। ভিক্ষে করতে যখন লোকালয়ে আসতাম তখন কষ্ট হত সবচেয়ে বেশি। আমাদের একসময়ে রাজার মতো সম্মান ছিল। তাই হাত পাততে ভীষণ লজ্জা করত। কিন্তু বেঁচে থাকতে গেলে তো সবই করতে হয়। আবার এরকম কষ্ট করে করে আমি শিখেছিও অনেক।”

হাবুল সম্মোহিতের মতো একদৃষ্টে গন্ধর্বের মুখের দিকে চেয়ে ছিল। কী সুন্দর মুখ, কী সরল চোখের দৃষ্টি। এই লোকটাকে দাদু কেন ভয় পাচ্ছে তা কিছুতেই তার মাথায় ঢুকছিল না। ভয় নয়, গন্ধর্বকে দেখে মায়া হওয়াই তো স্বাভাবিক।

গন্ধর্ব অন্যমনস্কের মতো জানালার বাইরে অন্ধকারের দিকে চেয়ে ছিল।

হাবুলের গলা ধরে আসছিল, অস্ফুট গলায় বলল, “আমাদের কাছে থাকো না গেনুদা। তোমার কোনও কষ্ট থাকবে না। আমার তো দাদা নেই, তোমাকে দাদা বলে ডাকব।”

গন্ধর্ব একটু অবাক হয়ে হাবুলের দিকে চাইল, তারপর সুন্দর করে হেসে বলল, “আমাকে তো তুমি ভাল করে চেনোও না এখনও।”

হাবুল জোরের গলায় বলল, “আমি জানি তুমি ভাল ছেলে।”

গন্ধর্ব মাথা নেড়ে বলল, “আমার তো কেউ নেই, তাই তোমাদের মতো একটা পরিবারে নিজের জনের মতো থাকতে পারলে ভালই হত। কিন্তু তা হওয়ার নয়।”

“কেন নয় গেনুদা?”

“আমার অনেক কাজ বাকি পড়ে আছে। পরে শুনবে।”

হাবুল উঠল। বলল, “আমি পড়তে যাচ্ছি। কাল তোমার গল্প শুনব।”

গন্ধর্ব ‘হ্যাঁ’ বা ‘না’ কিছু বলল না। একটু হাসল মাত্র।

পড়ায় একদম মন লাগছিল না হাবুলের। দাদুর ঘরে বন্ধ দরজার পিছনে কী নিয়ে কথা হচ্ছে তা বারবার আন্দাজ করার চেষ্টা করছিল সে।

অবশেষে রাত দশটা নাগাদ দরজা খুলে সকলে বেরিয়ে এল। প্রত্যেকের মুখই গম্ভীর এবং থমথমে। চুপচাপ যে যার ঘরে চলে গেল।

রাতে সকলেই একসঙ্গে খেতে বসল বটে, কিন্তু কেউ কারও সঙ্গে ভাল করে কথা বলছিল না। গন্ধর্বকে শুধু ভদ্রতাসূচক দু' একটা কথা বলা হল।

খাওয়ার পর হাবুলের ছোটকাকা বিরু এসে হাবুলের ঘরে ঢুকল। বিছানায় শুয়ে পায়ের ওপর পা তুলে হাঁটু নাচাতে-নাচাতে বলল, "সব শুনেছিস?"

ছোটকাকা যেমন সাহসী, তেমনি আমুদে। ছোটকাকাকে হাবুল খুব ভালবাসে। সে বলল, "কিছু শুনিনি তেমন, কী হয়েছে ছোট্কা?"

"কেস খুব খারাপ। আমাদের যা কিছু সম্পত্তি-টম্পত্তি আছে, সব নাকি ওই ছোকরার। বাবাকে নাকি ওর দাদু মেলা বিষয়সম্পত্তি দিয়েছিলেন। কথা ছিল তার নাতি কোনওদিন ফিরে এলে সব ফিরিয়ে দিতে হবে। সেই নাতি হাড্রেড পারসেন্ট হাজির।"

হাবুল হঠাৎ একটু রেগে গিয়ে বলে, "এই লোকটাই যে রামদুলালের নাতি, তার কোনও প্রমাণ আছে!"

বিরু ঠ্যাং নাচাতে নাচাতেই বলল, "আছে, একটা আংটি আর একটা চিঠি।"

"আর দাদু যদি সম্পত্তি ফিরিয়ে না দেয়?"

বিরু একবার হাবুলের দিকে তাকিয়ে নিল। তারপর একটা হাই তুলে বলল, "বাবা সেরকম লোক নয়। রামদুলালের নাতি না এলে.সম্পত্তি দিতে হত না, কিন্তু এসে যখন পড়েছে, তখন উপায় নেই। স্মাজ বৈশাখী অমাবস্যা। আজ রাতেই শ্বেত আর লোহিত নামে দুটো লোক আসবে। তারা রামদুলালের বিশ্বস্ত দুই প্রজা। তারা নাকি প্রত্যেক বৈশাখী অমাবস্যায় এসে দেখে যায় রামদুলালের নাতি এল কি না। আমি অবশ্য কোনওদিন শ্বেত আর লোহিতকে দেখিনি। তুই দেখেছিস?"

হাবুল ভ্রূ কুঁচকে একটু ভাবল। তারপর বলল, "দেখেছি. দু'জন ঠিক একরকম দেখতে। খুব স্ট্রং চেহারা, তবে বুড়ো। একজন ফর্সা, একজন কালো।"

"তা হলে ঠিকই দেখেছিস। তারা যমজ ভাই। তাদের ওপর হুকুম আছে সম্পত্তি ফিরিয়ে দেওয়া না হলে তারা বাবাকে খুন করবে।"

"ইশ, খুন করা অত সোজা?" হাবুল ফোঁস করে উঠল।

বিরু ঠ্যাং নাচানো বন্ধ করে বলল, "খুন করা যে সোজা নয়, তা ওরাও জানে, আমরাও জানি, ওরা এও জানে যে, খুন করার দরকারও হবে না। বাবা সবই ফিরিয়ে দেবে। তবে শ্বেত আর লোহিতকে আণ্ডারএস্টিমেট করাও ঠিক নয়। তারা এক সময়ে রামদুলালের লেঠেল ছিল। বিস্তর খুনখারাপি করেছে।"

"আমি দুই ঘুঁষিতে দু'জনকে...।"

"থাক থাক, আর বীরত্বে কাজ নেই। সম্পত্তি যখন ফিরিয়েই দেওয়া হচ্ছে তখন আর চিন্তা কী?"

হাবুল হঠাৎ কাকার দিকে তাকিয়ে বলল, "তা হলে সবাই চিন্তা করছে কেন?"

বিরু ঠ্যাং নাচাতে নাচাতে ছাদের দিকে চেয়ে কী যেন ভাবছিল। একটা শ্বাস ফেলে বলল, "ভাববার কারণ আছে।"

"কী কারণ?"

"বাবার কাছে রামদুলালের একটা আংটি ছিল। দামি হিরের আংটি, দেড় দু'লাখ টাকা দাম। ঠিক আংটি বললেও ভুল হবে, ওটা একটা রাজকীয় অভিজ্ঞান। গন্ধর্বর আঙুলেও ঠিক ওরকম একটা আছে। প্রতিবার

বাবাকে শ্বেত আর লোহিত এলে সেই আংটি দেখাতে হয়। গতবারও দেখিয়েছে। আজ বৈশাখী অমাবস্যা বলে দুপুরবেলা নাকি আংটিটা বের করতে গিয়েছিল বাবা। দেখে, আংটি চুরি গেছে।"

হাবুল চমকে উঠে বলল, "চুরি! এ-বাড়ি থেকে?"

"সেইটেই তো আশ্চর্যের বিষয়। বাবা নিজে দারুণ সাবধানী, তার ওপর এতগুলো লোক আমরা রয়েছি বাড়িতে, জিমি আছে, চুরি গেল কী করে সেটাই রহস্য।"

"দাদু কী বলল?"

"কী করে চুরি গেল তা বাবা কিছুতেই বুঝতে পারছে না। আংটিটা ছিল লোহার আলমারির মধ্যে, চাবি বাবার কাছে থাকে। রাত্রিবেলা বালিশের নীচে চাবির গোছা নিয়ে শুয়ে থাকে। তবু চুরি গেছে।"

"তোমরা পুলিশ ডাকবে না ছোট্‌কা?"

"সে তো নিশ্চয়ই। কিন্তু আজ রাতে শ্বেত আর লোহিত এলে তো সেই আংটি দেখানো যাবে না।"

"আজই দেখাতে হবে? দু'দিন সময় নিলে হয় না?"

বিরু মাথা নেড়ে বলল, "না, শ্বেত আর লোহিত প্রিমিটিভ ওয়ার্ল্ডের লোক। কতগুলো অন্ধ কুসংস্কার মেনে চলে। বৈশাখী অমাবস্যার রাত ছাড়া ওই আংটির দিকে যে তাকাবে, সে-ই নাকি অন্ধ হয়ে যাবে। অবশ্য রামদুলালের বংশধররা ছাড়া।"

"যাঃ, যত সব গুলগল্প।"

বিরু হাসছিল। ঠ্যাং নাচানো অব্যাহত রেখে বলল, "তা হবে, কিন্তু আমার বাবাও সেই গুলগল্প বিশ্বাস করে। বাবাও বৈশাখী অমাবস্যা ছাড়া ওই আংটির দিকে কখনও তাকায়নি। প্রবলেম হল, শ্বেত আর লোহিতকে যদি আংটি না দেখানো যায়, তবে তারা খুব ঠাণ্ডা মাথায় বাবাকে খুন করার প্ল্যান নেবে।"

"নিক না। আমরাও পুলিশে খবর দিচ্ছি।"

বিরু একটু ম্লান হেসে ধমক দিল, "দূর বোকা! খুনের ভয়টাই কি একমাত্র ভয়? আংটি চুরি যাওয়াটা লজ্জার ব্যাপার না? বিশেষ করে আজই যখন রামদুলালের নাতি তার বিষয়সম্পত্তি দাবি করতে এসেছে, ঠিক সেদিনই আংটিটা খুঁজে না-পাওয়া একটা বিশ্রী অস্বস্তির কারণ। বাবা ভীষণ ভেঙে পড়েছে।"

"গন্ধর্ব চুরির কথা জানে?"

বিরু মাথা নেড়ে বলল, "গন্ধর্ব কিছুই জানে না।"

হাবুল গম্ভীর হয়ে বলল, "গন্ধর্বদা খুব ভাল লোক।"

"হ্যাঁ, আমার সঙ্গেও আলাপ হয়েছে। বেশ ছেলে, চালাক চতুর। তোর মতো হাবা নয়।"

"গন্ধর্বদা খুব কষ্ট পেয়ে এতদূর এসেছে।"

বিরু একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, "আর একটু কষ্ট করে যদি আজকের বৈশাখী অমাবস্যাটা পার করে আসত, তা হলে আর কোনও ঝামেলা থাকত না।"

"কেন, ঝামেলা থাকত না কেন?"

"বাবার সঙ্গে নাকি রামদুলালের শর্ত ছিল আজকের বৈশাখী অমাবস্যা পার হয়ে গেলে এবং তার নাতি না এলে বিষয়সম্পত্তি চিরকালের মতো বাবার হয়ে যাবে। আর কোনও দায় থাকবে না। শ্বেত আর লোহিতও আর আসবে না।"

"ইশ! সত্যি?"

"বাবা তো তাই বলল, সবই প্রিমিটিভ আমলের ব্যাপার-স্যাপার।" বলে বিরু খানিকটা আনমনা হয়ে রইল। তারপর বলল, "কিন্তু আংটিটাই ঝামেলা পাকিয়েছে। ওই পয়মন্ত আংটির দামটাও বিশ্রীরকম বেশি, তার ওপর ওটা নিয়ে নানা কিংবদন্তী আছে, মেটেরিয়াল ভ্যালুর চেয়েও কিংবদন্তীর ভ্যালু অনেক হাই।"

হাবুল দাদুর জন্য চিন্তিত হয়ে পড়ল। বলল, "আংটিটা কীভাবে চুরি গেল তা তুমি ভেবে পাচ্ছ?"

বিরু মাথা নেড়ে বলল, "না। চোর কোনও প্রমাণ রেখে যায়নি। তবে বাবা বলল, দু'তিন দিন আগে এক সকালে উঠে বাবা ঘরের দরজা খোলা দেখেছে। বাবার ঘরে পাঁচুদাও শোয়। দু'জনের কারওই ভাল ঘুম হয় না, বার-বার ওঠে। ফলে দু'জনেরই কেউ হয়তো একবার দরজা ঠিকমতো লাগাতে ভুলে গেছে। এই ভেবে বাবা আর বেশি উচ্চবাচ্য করেনি।"

"তোমার কাউকে সন্দেহ হয় না ছোট্কা?"

"না, সন্দেহের স্টেজ এখনও আসেনি। এখন বিস্ময়ের স্টেজ চলছে। বিস্ময় কাটলে সন্দেহ শুরু হবে।"

বিরু শুয়ে-শুয়ে ঠ্যাং নাচাতে লাগল

তা হলে কী হবে ছোটকা?"

বিরু খুব চিন্তিত মুখে বলল, "একটা আইডিয়া মাথায় এসেছে। তবে তাতে কতদূর কাজ হবে তা জানি না।"

"কী আইডিয়া?"

"শ্বেত আর লোহিতকে যদি আজ রাতের মতো এ-বাড়িতে ঢোকা থেকে ঠেকিয়ে রাখা যায়, তা হলে অনেক দিক সামাল দেওয়া যাবে।"

হাবুল উজ্জ্বল হয়ে বলল, "খুব ভাল আইডিয়া ছোটকা।"

বিরু আনমনে ভাবতে-ভাবতে বলল, "আইডিয়া তো ভাল, কিন্তু ঠেকানো যাবে কী ভাবে, সেটাই তো ভেবে পাচ্ছি না। কোন্ দিক দিয়ে তারা আসবে, তা জানা নেই, তাদের চেহারা জানি না, কেমন স্বভাবের লোক তাও জানি না, ঠেকাব বললেই কি ঠেকানো যায়?"

হাবুল সোৎসাহে বলল, "আমি তাদের চিনি। চলো, ঠিক খুঁজে বের করে ফেলব।"

"তারপর কী করবি?"

"রাস্তায় ল্যাং মেরে ফেলে দেব।"

বিরু এই বিপদের মধ্যেও হোহো করে হেসে উঠল। তারপর বলল, "ল্যাং মেরে ফেলে দিলে কি তারা ছেড়ে দেবে?"

"না, ঝগড়া করবে। আমিও ঝগড়া করব। করতে করতে রাত কেটে যাবে।"

বিরু আবার হেসে উঠে বলল, "তুই চাইলেও তারা সারা রাত ঝগড়া করতে চাইবে কেন? কাজের লোকেরা ঝগড়া-টগড়া করতে ভালবাসে না।"

"ল্যাং'টা একটু জোরে মারলে পা মচ্কে গিয়ে যদি..."

ঠিক এই সময়ে দরজায় পাঁচু এসে দাঁড়াল। চোখ দুটো ধকধক করে জ্বলছে, মুখে ফেটে পড়ছে চাপা রাগ। গলায় একটা ব্যাঘ্রগর্জনের মৃদু নমুনা তুলে বলল, "কী শলাপরামর্শ হচ্ছে তোমাদের তখন থেকে? বাতি

নিবিয়ে শুয়ে পড়ো না।"

পাঁচুর মুখে-চোখে রাগ থাকলেও ধমকের তেমন তেজ নেই। শুয়ে পড়তে বলছে বটে কিন্তু সেটা চাইছে না।

হাবুল গিয়ে পাঁচুর হাত ধরে ঘরে টেনে এনে বলল, "পাঁচুদা, তুমি শ্বেত আর লোহিতকে চেনো?"

পাঁচু মেঝের ওপর হাঁটু মুড়ে বসে ক্লান্তির একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, "খুব চিনি। তাদের কাণ্ডকীর্তির কথাও মেলা জানি। রামদুলালের বাড়ির মাটির তলার চোর-কুঠুরিতে এখনও শ'য়ে শ'য়ে মানুষের কল পাওয়া যাবে।"

পাঁচু কাঁধের গামছায় ঘামে ভেজা মুখ মুছে একটু দম নিয়ে বলল, "বাইরে থেকে তোমাদের কথা সব শুনেছি। শ্বেত আর লোহিতকে ঠেকানোর বুদ্ধিটা ভাল। রাত কেটে গেলে তারা কাল সকালে আর আংটি দেখতে চাইবে না। কিন্তু তাদের ঠেকানো বড় সহজ কাজ নয়। আমার তো ইচ্ছে ছিল দুটোকেই বল্লমে গেঁথে নিকেশ করে দিই। ফাঁসি হলে আমার হবে। কিন্তু কর্তামশাই সে-কথায় চটে যান।"

বিরু সোজা হয়ে বসে বলল, "ঘটনাটা কী, একটু বলবে পাঁচুদা?"

পাঁচু মাথা নেড়ে বলল, "সে সাতকাহন গল্প।কর্তামশাই যখন দেশ ছেড়ে পশ্চিমে রওনা হন, তখন দেশে ঘোর আকাল। ট্রেনে চেপে যেতে-যেতে ভোরবেলা একটা জায়গায় গাড়ি থামতেই কর্তামশাই লটবহর নিয়ে নেমে পড়লেন। মনে-মনে নাকি সংকল্পই ছিল যেখানে ভোর হবে সেখানেই নেমে পড়বেন। তা জায়গাটা খুব খারাপও ছিল না। দু'চারদিন ঘোরাঘুরি করে একদিন এক মুদির দোকানে খবর পেলেন, কয়েক মাইল দূরে পাহাড়ে ঘেরা একটা আজব জায়গা আছে, সেখানে কাজ মিলতে পারে।"

বিরু বলল, "এ গল্প তো আমরা জানি। জায়গাটার নাম লক্ষ্মণগড়।"

"জানো, কিন্তু সবটা জানো না। লক্ষ্মণগড়ে রামদুলাল রায় রাজত্ব করত বটে, কিন্তু নামে মাত্র। জমিদার ছোট, প্রজা মাত্র কয়েক ঘর। তার ওপর সাত শরিকে ঝগড়া। বড় তরফ রামদুলাল কর্তামশাইকে কাজ দেন। বাচ্চা-বাচ্চা ছেলেমেয়েকে পড়ানোর কাজ। সামান্য বেতন। কষ্টেসৃষ্টে কর্তাশাইয়ের চলে যেত। তবে এ-কথা সত্যি যে, কয়েক বছরের মধ্যেই কর্তামশাই রামদুলালের খুব বিশ্বাসী লোক হয়ে উঠেছিলেন। সবাই জানত কর্তামশাই এক কথার মানুষ। সত্যবাদী, চালচলনে সংযত। এই সময়ে রাজবাড়ির বুড়ো-পুরুত মারা যাওয়ায় কর্তামশাইকে রামদুলাল পুরোহিতের কাজটাও দেন। তা বিশালাক্ষীর মন্দিরটা ছিল বহু পুরনো, অনেকদিন কোনও সংস্কার হয়নি। রামদুলালের এমন টাকা নেই যে, মন্দির সারাই করে। কর্তামশাই তাই একদিন নিজের হাতেই মন্দির সংস্কার করতে লেগে গেলেন। আর সেই ঘটনাতেই যত বিপত্তি। সে-গল্প জানো?"

বিরু মাথা নেড়ে বলল, "না, শুনিনি।"

হাবুল নড়েচড়ে বসল।

পাঁচু একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, "অত্যন্ত গোপন কথা। এতকাল কাউকে বলার হুকুম ছিল না। আজ বিপদের দিনে বলছি। সেও এক বৈশাখী অমাবস্যার দিন। কর্তামশাই বিকেলে একটা শাবল দিয়ে বিগ্রহের সিংহাসনের তলায় জমা শ্যাওলা চেঁছে পরিষ্কার করছিলেন। সিংহাসনটা হঠাৎ ঢকঢক করে নড়ে উঠল। তলায় মেঝের ওপর দেখা গেল একটা চৌকোনা ফাটল। কর্তামশাই প্রথমটা ঘাবড়ে গেলেও কাউকে কিছু বললেন না। গভীর রাতে মন্দিরে ঢুকে ফের সেই আড়াইমন ভারী সিংহাসন টেনে সরিয়ে শাবলের চাড় দিয়ে চৌকোনা

জায়গাটা ফাঁক করলেন। কাজটা বলতে যত সহজ, কাজে ততটা ছিল না। ভারী পাথরের সেই চাংড়া তুলতে হাতি লাগে।”

হাবুল হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, “তুমি তখন কোথায় ছিলে?”

পাঁচু সামান্য একটু হাসল। বলল, “কর্তামশাইয়ের সঙ্গেই। দুজনে মিলেই ওই কাণ্ড করি। পাথর সরাতেই দেখি নীচে গর্ত। প্রায় সাত হাত গভীর কুয়োর মতো। সেই গর্তের মধ্যে দুটো পেতলের বাক্স। কুলুপ আঁটা। আমরা দুজনেই বুঝতে পারলুম যে, এ হল গুপ্তধন। ইচ্ছে করলেই আমরা সেই দুটো বাক্স রাতারাতি সরিয়ে ফেলতে পারতুম, রামদুলাল টেরও পেত না। গর্ত চাপা দিয়ে সিংহাসনটা জায়গামতো বসিয়ে দিলেই হল। কিন্তু কর্তামশাই তা হতে দিলেন কই? পরদিন সকালে রামদুলালকে চুপি-চুপি খবরটা দিলেন। সেই থেকে রামদুলালের অবস্থা ফিরে গেল।”

হাবুল বলল, “তোমাদের কিছু দিল না?”

পাঁচু মাথা নেড়ে বলল, “দিয়েছিল, সামান্য কিছু বখশিশ। যা পেয়েছিল, তার তুলনায় কিছুই নয়। সোনাদানা মোহর হিরে জহরত মিলিয়ে সে কোটি টাকা হবে। টাকা পেয়েই বাবুয়ানির মাত্রা বাড়িয়ে দিল রামদুলাল। ঘনঘন ভোজ দিতে লাগল, বাড়ির ভোল পাল্টাল, নতুন গাড়ি কিনল। আর তাই দেখেই শরিকদের মধ্যে গুজগুজ ফুসফুস শুরু হয়ে গেল। লোক তারা বড় ভালও ছিল না। শচীদুলাল ছিল সাক্ষাৎ ডাকাত। যেমন রাগী, তেমনি নির্দয়। রামদুলাল যে বিশালাক্ষী মন্দিরে বংশগত গুপ্তধন পেয়েছে, এ-কথাটাও চাউর হতে বিশেষ দেরি হয়নি। আমার মনে হয় আহ্লাদে বেহেড হয়ে রামদুলাল নিজেই সে-কথা কবুল করেছিল। ফলে শরিকরা দাবি করতে লাগল, গুপ্তধন একা রামদুলালের নয়, ওতে তাদেরও ভাগ আছে। ফলে লেগে গেল বখেরা। ঝগড়া কাজিয়ায় লক্ষ্মণগড় তখন গরম। সেই গরমের মধ্যেই একদিন আর-পাঁচজন শরিকের লোজন নিয়ে শচীদুলাল চড়াও হল রামদুলালের ওপর। রক্তগঙ্গা বয়ে গেল।”

“কেউ বাঁচেনি?”

পাঁচু ফের গামছায় মুখ মুছে বলল, “কর্তামশাই বুদ্ধিমান লোক। কিছু একটা ঘটবে আঁচ করে নিজের পরিবারকে আগেভাগেই দেশে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। শুধু আমি তাঁর সঙ্গে ছিলাম। রামদুলাল তাড়া খেয়ে শুধুমাত্র একটা নাতিকে কোলে নিয়ে পালাতে পেরেছিল।”

হাবুল বলল, “তা হলে দাদুকে সম্পত্তি দিয়েছিল কখন?”

পাঁচু গামছা ঘুরিয়ে হাওয়া খেতে-খেতে বলল, “কর্তামশাইয়ের মতো বিশ্বাসী লোক যে হয় না, তা রামদুলালের চেয়ে ভাল আর কে জানে? একটা পেতলের বাক্স সে কর্তামশাইয়ের কাছে আগেই গচ্ছিত রেখেছিল। তখনই ওই শর্ত করে রাখে। তবে শর্ত এও ছিল, পঁচিশ বছরের মধ্যেও যদি তার নাতি গিয়ে সম্পত্তি দাবি না করে তবে তা তোমার দাদুর হয়ে যাবে। যখন এই শর্ত হয়, তখন সাক্ষী ছিলুম আমি আর শ্বেত লোহিত নামে দুই যমজ ভাই। রামদুলালও আন্দাজ করেছিল, শরিকরা একদিন চড়াও হতে পারে, তাই আগেভাগেই নিজের ভবিষ্যৎ গোছাতে ওই বাক্সটা কর্তামশাইয়ের কাছে চালান দেয়। হিরের আংটিটা ছিল ওই বাক্সের সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস। একটা ভূর্জপত্রে লেখা ছিল: এই অভিজ্ঞান যেন কখনওই পরহস্তে না যায়। যদি যায়, তা হলে বংশের বাইরের কেউ যেন একমাত্র বৈশাখী অমাবস্যার রাত ছাড়া এই আংটির দিকে না

তাকায়। তাকালে সে অন্ধ হয়ে যাবে। অন্য বাক্সতেও ঠিক ওই রকম একটা আংটি ছিল, যা এখন গন্ধর্বর হাতে রয়েছে।"

হাবুল জিজ্ঞেস করল, "গন্ধর্বদার আংটির দিকে তাকালেও কি চোখ অন্ধ হয়ে যাবে আমাদের?"

পাঁচু মাথা নেড়ে বলল, "না। ওই বংশের কারও হাতে থাকলে আর ভয় নেই।"

বিরু মৃদু হেসে বলল, "এসব কিংবদন্তী হল ফর সিকিউরিটি'জ শেক। যাতে কেউ আংটি চুরি করতে সাহস না পায়।"

হাবুল বলল, "তারপর কী হয়েছিল জানো?"

পাঁচ মাথা নেড়ে বলল, "রামদুলাল আর তার নাতির কী হয়েছিল তা আর জানি না। লোকটা বড় জেদি আর একগুঁয়ে। রাজবংশের ধাত যাবে কোথায়? কর্তামশাইয়ের কাছে এলে রাজার হালে থাকতে পারত। কিন্তু তা সে করেনি। রাজ্যোদ্ধারের চেষ্টাতেই নাকি জীবনটা দিয়েছে। আর কর্তামশাইয়ের কথা তো জানোই। সেই পেতলের বাক্সের ধনসম্পত্তি দিয়ে এখানে জোতজমা করেছেন। নানা কারবারেও তাঁর মেলা টাকা খাটছে। কিন্তু সর্বদাই তিনি জানেন যে, এসব কিছুই তাঁর নয়। সেইজন্যেই তোমাদের কখনও বাবুয়ানা করতে দেন না, সর্বদা স্বাবলম্বী হতে শেখান।"

হাবুল বলল, "শ্বেত আর লোহিতের কথা কিছু বললে না?"

পাঁচু মাথা নাড়ল, "বলে লাভ নেই। তারা ঠিকই আসবে। কর্তামশাইকে তারা কোনওদিনই পছন্দ করত না। তবে এটা ঠিক, তাদের মতো বিশ্বাসী লোক হয় না। রামদুলাল বা নাতির জন্য তারা জান দিতে পারে। বুড়ো হয়েছে বলে দুর্বল ভেবো না। বুড়ো হাড়েও অনেক ভেলকি দেখাতে পারে। আজকের রাতটা কেটে গেলে তাদের জারিজুরি শেষ, এটা তারাও জানে। কাজেই আজ রাতে তারা আসবেই। হয়তো সহজপথে না এসে বাঁধা পথ নেবে। দু'জনেই অতিশয় ধূর্ত। সুতরাং ল্যাং মেরে ফেলে দেওয়ার আশা ছাড়ো। অত সহজ কাজ নয়।"

বিরু নড়েচড়ে বসে বলল, "তা হলে কী করা যায় বলো তো!"

পাঁচু কিছুক্ষণ ঝিম মেরে থেকে বলল, "কিছু একটা করতেই হবে। চুপচাপ বসে থাকলে তো চলবে না। আংটিচোর যেই হোক, সেও অতি পাকা লোক।"

হাবুল একটু উত্তেজিত গলায় বলল, "আংটি দেখাতে না পারলে ওরা দাদুকে মেরে ফেলবে কেন?"

পাঁচু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "সেই রকমই কথা হয়েছিল। আংটি হারালে রামদুলালের বংশ লোপাট হয়ে যাবে। আপৎকালে অন্যের কাছে গচ্ছিত রাখা চলে, কিন্তু চুরি গেলে বা হারালে চলবে না। পাছে লোভে বা অভাবে পড়ে কর্তামশাই আংটি বেচে দেন বা হারিয়ে ফেলেন, সেই ভয়েই ওরকমধারা শর্ত করা হয়েছিল। তবে, বাপু, খুনখারাপির কথা রামদুলালের মাথায় আসেনি, সে কর্তামশাইকে বাস্তবিকই বিশ্বাস করত। খুনের কথা তোলে ওই শ্বেত আর লোহিত। আজ তারা বগল বাজাবে।"

॥ ছয় ॥

রাত সাড়ে দশটা নাগাদও যখন বাড়িতে কেউ ঘুমোতে গেল না, তখন রতন বাঁড়ুজ্যে তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সবাইকে ডেকে বললেন, "তোমরা যে যার ঘরে গিয়ে দোর দিয়ে শুয়ে পড়ো। সাড়াশব্দ কোরো না। সব বাতি নিবিয়ে দাও। আজ রাতে আমার কাছে বিশেষ দু'জন অতিথি আসবে, তাদের সঙ্গে আমার জরুরি কথা আছে। তা ছাড়া আর একজন বিশেষ অতিথি বাড়িতে আছেন, তিনি যেন ঘুণাক্ষরেও কিছু টের না পান।"

রতন বাঁড়ুজ্যের আদেশ অমান্য করার সাধ্য কারও নেই। সকলেই ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করল।

আস্তে-আস্তে অমাবস্যার রাত গভীর হতে লাগল। নিজের ঘরে রতন বাঁড়ুজ্যে আর পাঁচু জেগে অপেক্ষা করতে লাগল।

রাত একটু গাঢ় হল, অন্ধকার আরও ঘুটঘুটি। শেয়াল, এক প্রহরের জানান দিল। রতন বাঁড়ুজ্যের বাড়ির বাগানে কোনও নড়াচড়া নেই কোথাও। শুধু জোনাকি জ্বলে আর ঝিঁঝি ডাকে অবিরাম।

হঠাৎ আমবাগানের দিক থেকে বেড়ালের মতো একটা ছায়া লাফিয়ে উঠল দেয়ালের ওপর। তারপর আরও একজন। দেয়ালের ওপর উঠে কিছুক্ষণ নিস্পন্দ রইল দুটি ছায়া। চারদিকটা ভাল করে অনুভব করে নিল। তারপর নিঃশব্দে ঝুল খেয়ে নেমে পড়ল বাগানে।

কুকুরটার ডেকে ওঠার কথা। ডাকল না। তেড়েও এল না।

দু'জনে গাছপালার ফাঁক দিয়ে নিঃশব্দে এগোতে লাগল।

উত্তরের ঘরের জানালা খোলা। জানালার নীচে কলাবতীর মস্ত-মস্ত ঝোপ। দুটি ছায়া নিঃসাড়ে সেই ঝোপের মধ্যে ডুবে গেল।

একটু বাদে অত্যন্ত আস্তে একজন মাথা তুলল। কান পেতে শুনল, ঘরের মধ্যে শ্বাসের আওয়াজ কীরকম হচ্ছে। ঘুমন্ত মানুষের শ্বাসের আওয়াজ অন্যরকম হয়।

নিশ্চিন্ত হয়ে লোকটা একটা স্পে-গান তুলে ঘরের মধ্যে তীব্র ঘুমের ওষুধ ছড়িয়ে দিল। শ্বাসের শব্দ আস্তে-আস্তে আরও গাঢ় হয়ে গেল।

জানালায় লোহার শিক, এবং তা বেশ মজবুত। স্প্রে-গান ঝোলার মধ্যে রেখে লোকটা একটা অ্যাসিডের শিশি বের করে দুটো শিকের গোড়ায় ঢেলে দিল একটু-একটু করে। কয়েক মিনিট পর দ্বিতীয় লোকটা দু'হাতের চাপে দুটো শিক দু'দিকে সরিয়ে অনেকটা ফাঁক করে ফেলল।

নিঃশব্দে ঘরে ঢুকল দুজন। একজন একটা কমজোরি টর্চ জ্বেলে বিছানায় আলো ফেলল। বলল, "ওই তো।"

অন্যজন একটু ঝুঁকে গন্ধর্বের আঙুল থেকে আংটিটা খুলে নিল। চোখের পলকে সেটা ট্যাঁকে খুঁজে সে ঘরের অন্যান্য জিনিসে মন দিল।

ঘরে খুব বেশি কিছু নেই। একটা কাঁসার গ্লাসে জল ঢাকা ছিল। সেটা ঝোলায় পুরল লোকটা।

দ্বিতীয়জন কোমর থেকে একটা ভোজালি বের করে বলল, "বলিস তো এবার খুনটা করে ফেলি।"

ষষ্ঠী চাপা গলায় বলল, "থাকগে, যেতে দাও।"

"তার মানে?"

"চুরি এক জিনিস, খুন অন্য। খুনের আর কোনও দরকারও নেই। আসল জিনিস পেয়ে গেছি।"

"কিন্তু আমার টাকাটা?"

ষষ্ঠী মৃদু একটু হেসে চাপা স্বরে বলল, "পাবে। ও সামান্য টাকা তোমার মারব না। এখন চলো, জায়গামতো জিনিসটা পৌঁছে দিতে হবে।"

দ্বিতীয় লোকটা আর আপত্তি করল না। দু'জনে আবার জানালা দিয়ে বেরিয়ে বাগান পেরিয়ে দেয়াল ডিঙিয়ে বাইরে চলে এল।

ষষ্ঠী হঠাৎ বলল, "কুকুরটা ডাকল না কেন বলো তো! তাজ্জব!"

টিকে বলল, "সেটাই ভাবছিলাম। ওরকম বদমেজাজি কুকুর একদম চুপ মেরে রইল?"

দু'জনে আমবাগানের ছায়ায় গা ঢাকা দিয়ে হেঁটে বাঁশবনের অন্ধকারে ঢুকল। এ-পথে শর্টকাট হয়, রাস্তাও নিরাপদ।

বাঁশবনে একটু গভীরে ঢুকেই টিকে ডাকল, "ষষ্ঠী।"

"চলো টিকেদা।"

"আংটিটা দে।"

"আংটি! আংটি তোমাকে দেব কেন? ও তো বখরার মাল নয়। তোমাকে থোক টাকা দেব বলেছি, ঠিক দেব।"

"আংটি বখরার জিনিস নয় কে বলল? আলবাত বখরার জিনিস। দে।"

ষষ্ঠী দু'পা পিছিয়ে গিয়ে হিংস্র গলায় বলল, "না।"

টিকে এক হাতে ষষ্ঠীর গলাটা টিপে ঘরে অন্য হাতে তাকে একটা পাঁচ কিলো ওজনের চড় কষাল। তারপর তার ট্যাঁক থেকে আংটিটা খুলে নিয়ে নিজের ট্যাঁকে রেখে বলল, "এবার চল।"

ষষ্ঠী আর গাঁইগুঁই করল না। গালে হাত বোলাতে-বোলাতে টিকের পিছু-পিছু হাঁটতে লাগল।

কালী স্যাকরা জেগে বসে থাকবে, এরকম কথা ছিল।আংটিটা পেলেই সে হিরে খুলে নিয়ে সোনা গলিয়ে ফেলবে।

কিন্তু কার্যত দেখা গেল, কালী স্যাকরা জেগে নেই। ঘর অন্ধকার, দরজাও বন্ধ।

ষষ্ঠী আর টিকে চাপা স্বরে ডাকল, "কালীদা! ও কালীদা!"

জবাব নেই।

ষষ্ঠী দরজায় ধাক্কা দিল। অমনি কপাট খুলে গেল ঝড়াত করে।

ভিতরে ঢুকে দৃশ্য দেখে দুজনেই হাঁ। কালী স্যাকরা উপুড় হয়ে পড়ে আছে। তার সিন্দুক খোলা, আলমারি হাঁ-হাঁ করছে। কী হয়েছে তা বুঝতে দু'জনের এক লহমা লাগল।

মুখে-চোখে জলের ছিটে দিতেই কালী স্যাকরা অবশ্য চোখ মেলল। ডুকরে কেঁদে উঠে বলল, "ষষ্ঠী, তোর মনে কি এই ছিল রে?"

ষষ্ঠী বিরক্ত হয়ে বলল, "কী হয়েছে বলবে তো!"

"হওয়ার আর বাকি কী রাখলি বাপ? চেয়ে দ্যাখ্, আমার এতকাল ধরে তিল-তিল করে জমানো টাকা-পয়সা সোনা-দানা সব পাঁচ মিনিটের মধ্যে লোপাট।"

টিকে ধমক দিয়ে বলল, "কী করে লোপাট হল সেটা বলো।"

কাঁদতে-কাঁদতে কালী স্যাকরা বলল, "মিনিট দশ-পনেরো আগে ষষ্ঠীর গলা শুনলুম বাইরে থেকে 'কালীদা, কালীদা' করে ডাকছে।

উঠে দরজা খুলে দিতেই একটা লোক ঘরে ঢুকে পড়ল। টুঁ শব্দটি করার সময় পেলাম না, একটা রদ্দা বসিয়ে মাটিতে ফেলে দিল। তারপর আর কিছু মনে নেই। উঠে দেখছি সব ফর্সা।"

টিকে ফোঁস করে একটা শ্বাস ফেলে বলল, "ষষ্ঠী লোকটা যে এক নম্বরের বদমাশ সেটা কে না জানে। সুযোগ পেলে নিজের মায়ের গয়নাও ও চুরি করবে। কিন্তু কালীদা, গত দু'ঘন্টায় ষষ্ঠী তোমার দোকানে আসেনি। কারণ ও আমার সঙ্গে ছিল।"

কালী স্যাকরা নিজের কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে বলল, "তা হলে সে ষষ্ঠীরই মাসতুতো ভাই হবে। কিন্তু আমি যে ধনেপ্রাণে গেলুম রে!"

ষষ্ঠী হঠাৎ বলল, "না, একেবারে যাওনি। সেই আংটিটা পাওয়া গেছে। যা চুরি গেল, তা সুদে-আসলে তুলে নিতে পারবে।"

দিশেহারা হয়ে কালী স্যাকরা বলল, "আংটি! কই, দেখি!"

টিকে ট্যাঁকে হাত রেখে বলল, "কিন্তু ভাগ-বাঁটোয়ারা কেমন হবে সেটা আগে শুনি।"

কালী বলল, "কত চাস?"

"পঞ্চাশ হাজার।"

"ও বাবা, বলিস কী রে ডাকাত? আমার কত গেছে জানিস? লাখ টাকার ওপর। তার ওপর চারশো টাকা আজ সন্ধেতেই ছেলেটার হাতে গুনে দিয়েছি।"

টিকে মাথা নেড়ে বলল, "তোমার যা গেছে তা উসুল করেও আংটির দৌলতে তোমার অনেক থাকবে। আমি পঞ্চাশ হাজার আর ষষ্ঠী পাঁচশো।"

"পাঁচশো!" বলে ষষ্ঠী চোখের পলক ফেলতে ভুলে গেল।

টিকে গম্ভীর ভাবে বলল, "পাঁচশো টাকায় আমাকে দিয়ে খুন করাতে চেয়েছিলি। টিকে তোর কাছে খুব শস্তা হয়েছে, না? পাঁচশো যে তোকে দেওয়া হচ্ছে এই ঢের।"

কালী স্যাকরা হাত বাড়িয়ে বলল, "আংটি যদি খাঁটি হয়, তবে পাঁচ হাজার পাবি, ষষ্ঠী পাবে ওই পাঁচশো। রাজি থাকলে দে।"

দু'পক্ষে তুমুল দরাদরি শুরু হয়ে গেল। আধঘন্টা বাদে সিদ্ধান্ত হল, ষষ্ঠী পাঁচ শো পাবে, টিকে পাবে দশ হাজার।

টিকে ট্যাঁক থেকে আংটিটা বের করে কালী স্যাকরার হাতে দিয়ে বলল, "এবার দ্যাখো, জিনিস খাঁটি তো?"

কালী স্যাকরা চোখে ঠুলির মতো একটা আতস কাচ লাগিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আংটিটা দেখে বলল, "সেইটেই। সন্দেহ নেই। কিন্তু আজ রাতে তো টাকা দিতে পারছি না। আমার যা ছিল এখানে, সব গেছে। তার ওপর এই ঘোর অমাবস্যায় ঘরের টাকা বের করাও পাপ। কাল সকালে এসে টাকা নিয়ে যাস।"

টিকে মাথা নেড়ে বলল, "ও বাবা, তা হবে না। টাকা না পেলে আংটি তোমার কাছে গচ্ছিত রাখে কোন্ মুখ্যু!"

বেজার মুখে উঠে কালী স্যাকরা দেয়ালে লাগানো গুপ্ত সিন্দুক খুলে টাকা বের করে দিয়ে বলল, "এখন বিদেয় হ। আমার অনেক কাজ।"

ষষ্ঠী আর টিকে বেরিয়ে এল। টিকের মুখে হাসি। ষষ্ঠী ধুতির খুঁটে চোখ মুছছে।

আগে-আগে টিকে, পিছনে ষষ্ঠী। সরু অন্ধকার গলিটার মুখে দেয়ালে পিঠ দিয়ে একটা পাগল-গোছের লোক দাঁড়িয়ে বিড়বিড় করছিল। তাকে বিশেষ নজর না করে পেরিয়ে যাচ্ছিল দুজনে।

কিন্তু ঘটনাটি ঘটল বিদ্যুতের বেগে। দুজনে ঠাহরই করতে পারল না যে, কী হল।

টিকে নিশ্চিন্ত মনে হাঁটছিল। তার গায়ে অসুরের জোর, কোমরে ভোজালি, বুকে দুর্জয় সাহস, ট্যাঁকে দশ হাজার গা-গরম-করা টাকা। এ-তল্লাটে তাকে ঘাঁটানোর সাহস কারও নেই।

কিন্তু পাগলটা হঠাৎ ঠ্যাং বাড়িয়ে ছোট্ট একটা ল্যাং মারল তাকে। আর সঙ্গে-সঙ্গেই ঘাড়ের ওপর এসে পড়ল হাতের চেটোর একটা দুর্জয় কোপ টিকে—দশাসই টিকে একবার মাত্র 'কোঁক' শব্দ করে উপুড় হয়ে পড়ে গেল। আর নড়ল না।

ষষ্ঠী ঘটনাটা বুঝতেই পারেনি। আচমকা টিকে ওরকম গদাম করে পড়ে যাওয়ায় সে বেশ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিল। পাগলটা খুব ধীরেসুস্থে হিসেব-নিকেশ করে তার কপালে একটা ছোট্ট গাঁট্টা মারল। ষষ্ঠী খুব অমায়িকভাবে বসে পড়ল মাটিতে। তারপর চোখ উল্টে গোঁ-গোঁ করতে লাগল।

পাগলটা নিচু হয়ে টিকের ট্যাঁক থেকে দশ হাজার আর ষষ্ঠীর ট্যাঁক থেকে পাঁচশো টাকা বের করে নিল।

জানালা দরজা বন্ধ করে কালী স্যাকরা বাতি জ্বেলে আংটিটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছিল। হিরেটা খুলে সোনা গলিয়ে ফেলতে হবে। নইলে চোরাই জিনিস, ধরা পড়তে কতক্ষণ?

ঠিক এই সময়ে বাইরে থেকে টিকে ডাকল, "কালীদা।"

কালী বিরক্ত হয়ে বলে, "আবার কী চাস?"

টিকে চাপা গলায় বলল, "বলছিলাম কী, আমার বউটা তো ভীষণ দজ্জাল, তুমি জানো।"

“তা জানি।”

“আমি এত রাতে বাড়ি ফিরলে বউ আমার ট্যাঁক হাতিয়ে দেখবে। টাকাটা পেলে নিয়ে নেবে। তাই বলছিলাম, টাকাটা আজ রাতের মতো তোমার কাছে থাক। কাল এক ফাঁকে যখন বউ বাড়িতে থাকবে না, তখন এসে নিয়ে যাব।”

এ-কথায় কালী স্যাকরা খুশি হল। টাকা তার প্রাণ। যতক্ষণ কাছে থাকে, ততক্ষণই মনটা ভাল থাকে। দশ হাজার টাকা হাতছাড়া হওয়ায় মনটা খিঁচড়ে ছিল এতক্ষণ।

“দাঁড়া, দরজাটা আজ রাতে আর খুলব না। জানালাটা ফাঁক করছি, হাত গলিয়ে দিয়ে দে।”

“তাই নাও কালীদা। টাকাটা সাবধানে রেখো। ফের যেন চুরি-ডাকাতি না হয়।”

কালী স্যাকরা জানালার ছিটকিনি খুলে পাল্লা ধরে অনেক ঠেলাঠেলি করল। কিন্তু পাল্লা এমন এটে গেছে যে, খুলল না। হতাশ হয়ে কালা বলল, “এ যে খুলছে না রে।”

টিকে বিরক্ত হয়ে বলল, “এইভাবে রাত কাবার করে দেবে নাকি? জানালা খুলছে না তো দরজাটাই একটু ফাঁক করো, টাকাটা দিয়ে চলে যাই। আমার অত সময় নেই।”

কালী অগত্যা দরজাটার হুড়কো খুলে একটু ফাঁক করল।

তারপর যে কী ঘটল, তা কালী স্যাকরা নিজেও বলতে পারবে না। একটুখানি ফাঁক হওয়া দরজাটা দিয়ে যেন একটা বিকট ঘূর্ণিঝড় বয়ে গেল।

কালী স্যাকরা চিতপাত হয়ে পড়ে গেল মেঝেয়।

পাগলটা কালী স্যাকরার দিকে একটুক্ষণ চেয়ে রইল। তারপর খুব ধীরেসুস্থে শিস দিতে দিতে কালীর কাজ করার জলচৌকিটার ওপর থেকে এখনও অক্ষত আংটিটা তুলে নিয়ে আলোয় একটু ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে আঙুলে পরে নিল। তারপর দেয়াল হাতড়ে-হাতড়ে বের করে ফেলল গুপ্ত সিন্দুক। কালীর কোমরের কষি থেকে চাবি খুলে নিয়ে সিন্দুক থেকে সোনাদানা আর টাকাপয়সা বের করে একটা লম্বা গেঁজেয় ভরে ফেলল। বেরিয়ে এসে দরজাটা ভেজিয়ে দিল, সাবধানে। দ্রুত পায়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। তার হাবভাবে আর পাগলামির চিহ্নও ছিল না।

গোটা ঘটনাটা ঘটতে দশ মিনিটের বেশি লাগেনি।

॥ সাত ॥

আমবাগানে দুজন দরোয়ান আছে। এক মারোয়াড়ি বাগান ইজারা নিয়ে দরোয়ান দুজনকে আনিয়ে পাহারা বসিয়েছে। ভোজপুরী দুই দারোয়ানেরই বেশ দশাসই চেহারা। পেতলে বাঁধানো লাঠি হাতে তারা পালা করে বাগান পাহারা দেয়। একজন ঘুমোলে অন্যজন জেগে থাকে। একজন খানা পাকায় তো অন্যজন ডন-বৈঠক দেয়। আমবাগানের মধ্যেই তারা ছোট্ট একখানা ঝোপড়ি বানিয়ে নিয়েছে। উনুন জ্বেলে সেখানেই তারা রুটি আর ভাজি তৈরি করে। কখনও মনের আনন্দে চেঁচিয়ে গানও গায়। তুলসীদাসের রামায়ণও পড়ে মাঝে-মাঝে।

আজ সন্ধের মুখে জটাজূটধারী একজোড়া সাধু এসে ঝোপড়ির সামনে দাঁড়িয়ে গাল বাজিয়ে বিকট চিৎকারে 'জয় শিব স্বয়ম্ভু, জয় সীতারাম, জয় বজরঙ্গবলী' বলে হাঁক মারতে দুজন দরোয়ানই ভড়কে গিয়ে একেবারে সাধুদের পায়ের গোড়ায় গিয়ে পড়ল। "গোর লাগি সাধুবাবা।"

দুই সাধুরই বয়স সাংঘাতিক। দেখলেই মনে হয় একশো বছর পার করে দিয়েছে। কিন্তু মেদহীন রুক্ষ শরীরে ব্রহ্মতেজ যেন ফেটে বেরোতে চাইছে।

সাধুরা ঝোপড়ির বাইরে দুটো খাটিয়ায় বসে খানিক জিরোল। ততক্ষণ দু'জন দরোয়ান রামরিখ আর রামভরসা খুব যত্ন করে হাওয়া করল তাদের। জলটল খাওয়াল মিছরি আর লেবু দিয়ে।

সাধুরা দুজনকেই বিস্তর আশীর্বাদ করে বলল, "তোদের সেবায় আমরা খুব খুশি হয়েছি রে বেটা। আজ রাতটাও তোদের ঝোপড়িতেই থেকে যাব। যা, ভাল করে রুটি পাকা। সঙ্গে অড়হর ডাল, ঘি আর আলু-পটলের ডালনা যেন থাকে।"

রামরিখ আর রামভরোসা এই আদেশে বিগলিত হয়ে গেল। ভাল করে আটা মেখে ভিজে ন্যাতায় জড়িয়ে রাখল রামরিখ। রামভরোসা ছুটল বাজারে, আলু আর পটল আনতে।

দুই সাধু সন্ধে থেকে রাত দশটা পর্যন্ত দুই খাটিয়ায় শুয়ে টানা ঘুম দিল। ততক্ষণ পালা করে রামরিখ আর রামভোসা তাদের পা টিপে দিল।

রান্না হওয়ার পর ডেকে তুলে যখন সাধুদের খাওয়াতে বসাল দু'জন, তখনই বুঝতে পারল, বাস্তবিক সাধুদের ক্ষমতার শেষ নেই। দু'জনকে দশখানা করে পুরু এবং বিশাল সাইজের রুটি দেওয়া হয়েছিল প্রথমে। সাধুরা স্রেফ ডাল দিয়ে উড়িয়ে দিল তা। আরও দশখানা করে ওড়াল ডালনা দিয়ে। শেষে চাটনি দিয়ে আরও পাঁচখানা করে।

ফলে রামরিখ আর রামভরোসাকে ফের আটা মেখে নিজেদের রুটি পাকিয়ে নিতে হল।

খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেলে পর দুই সাধু মিলে সিদ্ধি খুঁটতে বসে গেল। ঘুঁটতে ঘুঁটতেই তারা নানারকম তত্ত্বতালাশ নিতে লাগল। কতদিন রামরিখ আর রামভবোসা এখানে আছে? জায়গাটা কেমন? দক্ষিণ দিকে ওই

বাড়িটা কার? ওখানে কে কে থাকে? কোনও নতুন লোক এদিক দিয়ে যায় কি না, ও বাড়িতে আজ কেউ এসেছে কি না, এইসব।

সাধুদের এসব কথা জিজ্ঞেস করাটা তেমন স্বাভাবিক ঘটনা নয়। তবে রামরিখ আর রামভরোসা নিতান্তই সহজ সরল এবং ভক্তিমান বলে কোনও সন্দেহ করল না। নানা কথার ফাঁকে তারা এও জানিয়ে দিল, ওই বাড়িতে আজ এক নতুন মেহেমান এসেছে। তার বয়স নিতান্তই কম। চেহারা গরিব দুঃখীর মতো।

সাধু দু'জন গম্ভীর ভাবে সব শুনে সিদ্ধি ঘোঁটা শেষ করে রামরিখ আর রামভরোসার লোটায় অর্ধেকটা সিদ্ধি ঢেলে দিয়ে নিজেরাও নিয়ে বসল।

এটা ওটা গল্প হতে-হতেই হঠাৎ রামরিখ আর রামভরোসার ভীষণ হাই উঠতে লাগল। চোখ বুজে আসতে লাগল ঘুমে। এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই কোনওরকমে মাটিতে গামছা পেতে শুয়ে দু'জনেই নাক ডাকাতে লাগল।

দুই সাধু লণ্ঠনের ম্লান আলোয় পরস্পরের দিকে চেয়ে একটু হাসল। তারপর ঝোলা থেকে টর্চ বের করে চারদিকটা ঘুরে-ঘুরে একটু দেখল।

আমবাগানের শেষে পুকুরধারে একটা মরা গাছ আছে। দুজনে সেই গাছটার তলায় এসে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

রাত্রি ক্রমে গভীর থেকে গভীরতর হতে লাগল। কিন্তু দুই সাধু পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে।

হঠাৎ তীব্র দুটো শিসের শব্দ হল পর-পর। একটা লম্বা, একটা খাটো। সাধু দুজন ধীরে-ধীরে গাছতলা ছেড়ে বেরিয়ে এল।

॥ আট ॥

ষষ্ঠী যখন চোখ মেলল, তখন তার কপালে মস্ত একটা ট্যাম। মাথাটা ঝিমঝিম করছে। চোখে সর্ষেফুলও দেখতে পাচ্ছে ষষ্ঠী। ওই অবস্থাতেই নিজের ট্যাঁকটা একটু হাতিয়ে দেখল সে। ফাঁকা।

কিছুক্ষণ ঝিম মেরে বসে থেকে আবার চোখ খুলে সে দেখল, টিকে এখনও গন্ধমাদনের মতো পড়ে আছে সামনে। দেখে ফিক করে একটু হেসে ফেলল ষষ্ঠী। তার মোটে পাঁচশো, টিকের গেছে দশ হাজার। উচিত শিক্ষা হয়েছে। ভগবান যা করেন, মঙ্গলের জন্যই করেন। কপালের ফের না হলে টিকের যাওয়ার কথা পাঁচশো, আর ষষ্ঠীর দশ হাজার।

দশ হাজার তার ট্যাঁক থেকে গেলে ষষ্ঠী শোকে আর উঠে দাঁড়াতে পারত না।

পাঁচশোর শোক অনেক কম। ষষ্ঠী তাই গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল, গন্ধমাদনটার দিকে তাকিয়ে আবার ফিকফিক করে হাসল সে। পাগলবেশী ডাকাতটা টিকে-কে একটা ল্যাং আর একটা বিরাশি সিক্কার রদ্দা কষিয়েছে। সেই তুলনায় ষষ্ঠীর ভাগে পড়েছে মাত্র একটা গাঁট্টা, ভগবানই চিরকাল গরিবকে দেখেন।

নিজের কপালের ট্যামটায় একটু হাত বোলাল ষষ্ঠী। তারপর টিকের ট্যাঁকটা হাতিয়ে দেখল। দেখে রাখা ভাল। টাকাটা যে সত্যিই গেছে সে-বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ষষ্ঠী টিকের কোমর থেকে ভোজালিখানা খুলে নিল। সাবধানের মার নেই।

তারপর ষষ্ঠী বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁতে দাঁত চেপে বলল, "বিশ্বাসঘাতক! শয়তান!" বলে ক্যাঁত-ক্যাঁত করে কয়েকটা লাথি কষাল টিকের কোমরে। টিকে অবশ্য লাথি-টাথি টের পেল না। তবে একবার গোঙানির শব্দ করে উঠতেই ষষ্ঠী দু' পা পিছিয়ে এল সভয়ে। দূর থেকেই আরও কিছুক্ষণ টিকের উদ্দেশে গালমন্দ বর্ষণ করে সে রণে ভঙ্গ দিল। আংটি গেছে, টাকা গেছে, তবু ষষ্ঠীর একরকম আনন্দই হচ্ছিল। তার মোটে পাঁচশো গেছে, কপালে মাত্র একটা ছোট্ট ট্যাম। আর টিকেটার গেছে দশ হাজার, হাঁটুতে ল্যাং, ঘাড়ে রদ্দা। ওঃ, যা আনন্দ হচ্ছে ষষ্ঠীর!

একটু জিরিয়ে এক ঢোঁক জল খাবে বলে ষষ্ঠী আবার কালী স্যাকরার দোকানে ফিরে এল। স্যাকরার পো আংটিটা জোর দাঁও মেরেছে। রাত জেগে বসে সোনা গলাচ্ছে নিশ্চয়ই।

ষষ্ঠী মৃদু স্বরে ডাকল, "কালীদা! ও কালীদা! ওঃ, যা হুজ্জোতটাই গেল। দেখগে গন্ধমাদনটা কেমন দাঁত ছরকুটে পড়ে আছে গলির মাথায়। হিঃ হিঃ..."

কিন্তু কালী স্যাকরার বন্ধ ঘর থেকে কোনও জবাব এল না।

ষষ্ঠী দরজাটা ঠেলতেই খুলে গেল।

সন্তর্পণে ঘরে ঢুকল ষষ্ঠী। তারপর হাঁ হয়ে গেল।

কালী স্যাকরা কেতরে পড়ে আছে মেঝেয়। আংটি হাওয়া। গুপ্ত সিন্দুক হাঁহাঁ করছে।

জিব দিয়ে একটু চুকচুক করে আফসোসের শব্দ করল ষষ্ঠী। এঃ, কালীদাকে একেবারে ফর্সা করে দিয়ে গেছে! গুপ্ত সিন্দুকের খবরটা আগে জানত না ষষ্ঠী। আজ রাতেই প্রথম দেখল, যখন কালী তাদের টাকা বের করে দিল।

ষষ্ঠী আপনমনেই বলল, "দুঃখটা কেন হয়েছ জানো কালীদা? নিল তো একটা অজ্ঞাতকুলশীল নিয়ে গেল সব। এ-কাজ তো আমারই করা উচিত ছিল। এঃ, টাকায় গয়নায় হিরের আংটিতে কয়েক লাখ বেরিয়ে গেল গো!"

দুঃখ করতে করতে আবার একটা খুশি-খুশি ভাবও এসে পড়ল ষষ্ঠীর। কালী স্যাকরা তার বন্ধু লোক হলে কী হয়, এক নম্বরের হাড়কেপ্পন। হাজার টাকার মাল নিয়ে দুশো টাকা ঠেকায়। লোকটা ঠকবাজ, জোচ্চোর তো বটেই, বাটপাড় বললে কম বলা হয়। পাপে দুনিয়াটাই ভরে গেল। কলিকাল আর বলে কাকে!

তা ভগবান সাজাটাও দিলেন বড় কম নয়। কথায় বলে ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। ভাবতে-ভাবতে ষষ্ঠী ফিক করে হেসে ফেলল। কালী স্যাকরার মাজা নির্ঘাত মচকেছে। চোখের নীচে কালশিটে। কপাল ফেটে রক্ত গড়াচ্ছে। পাপের শাস্তি।

ষষ্ঠী খুব আদরের সঙ্গে নিজের কপালের ট্যামটাতে হাত বোলাল। তার কপালে মোটে একটা ট্যাম! তাও খুব বেশি হলে একটা সুপুরির সাইজ। আর ট্যাঁক থেকে গেছে মোটে পাঁচশো টাকা। ছোট পাপের ছোট শাস্তি। আর কালীদাকে দ্যাখো।

ফিকফিক করে কিছুক্ষণ খুব হাসল ষষ্ঠী।

তারপর হাসি থামিয়ে ষষ্ঠী খুব তাড়াতাড়ি ঘরটা খুঁজে দেখে নিল, নাঃ, কিছু নেই। পাগলটা সব নিয়ে গেছে।

পাগল! আরে, এতক্ষণে পাগলটার কথাই তো সে ভাল করে ভেবে দেখেনি! ষষ্ঠী খুব মন দিয়ে ভ্রূ কুঁচকে দৃশ্যটা মনে করার চেষ্টা করল। একটা পাগল গলির মুখে দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে বিড়বিড় করছিল আর আপনমনে হাসছিল।

হ্যাঁ, ষষ্ঠী এবার পরিষ্কার পাগলটাকে মনে করতে পারল। অন্ধকার ছিল বটে, কিন্তু পাগলটা কতটা লম্বা, হাত-পায়ের গড়ন কীরকম, নড়াচড়া কীরকম, এগুলোর একটু আন্দাজ পেয়েছিল সে। আর আশ্চর্যের বিষয়, পাগলটাকে তার খুব চেনা লাগছে। খুব চেনা-চেনা।

হুঁ হুঁ বাবা, ষষ্ঠীর চোখকে ফাঁকি দেবে, এমন এলেম তোমার পেটে নেই। একটু ভাবতেই ষষ্ঠী ধরে ফেলেছে লোকটা কে।কিন্তু সে ভেবে অবাক হল, এতখানি বয়সে সে নিজে আজও যে-বিদ্যে বাগাতে পারেনি, ওইটুকু একরত্তি ছেলে এর মধ্যেই এত শিখে ফেলল কী করে? ষষ্ঠী নিজে পাকা চোর, টিকে দুর্দান্ত গুণ্ডা, কালী স্যাকরা শেয়ালের মতো ধুরন্ধর। অথচ এই তিনজনকে একই দিনে দু' দুবার ঘোল খাইয়ে গেল ওই দুধের খোকা?

ভাবতে ভাবতে লজ্জায় ঘেন্নায় শরীরটা শক্ত হয়ে গেল ষষ্ঠীর। মান-ইজ্জত সবই গেল তার। এর একটা বিহিত না করলেই নয়।

শক্ত করে ভোজালিটা চেপে ধরে ষষ্ঠী আরও খানিকক্ষণ ভাবল। কাজটা শক্ত সন্দেহ নেই। একে রতন বাঁড়ুজ্যের বাড়িতে দ্বিতীয়বার ঢোকা। তার ওপর ওই তুখোড় ছোকরার সঙ্গে গায়ের জোর, বুদ্ধি আর

বদমাইসিতে পাল্লা টানা। কাজটা খুবই শক্ত।

তবে যদি কোনওরকমে কাজটা হাসিল করে ফেলতে পারে ষষ্ঠী, তবে এক রাতেই সে রাজা হয়ে যাবে। কালী স্যাকরার কয়েক লাখ টাকা আর সোনার গয়না, লাখ টাকার হিরের আংটি মিলিয়ে যা হবে তা কল্পনাও করা যায় না। একটা নয়, দুটো ডাকাতের দল খুলবে ষষ্ঠী। একশোটা বন্দুক কিনে ফেলবে। রোজ শুধু পোলাও কালিয়া খাবে। বারোটা গামছা কিনবে। দুটো গাই-গোরু। একটা মোটরগাড়ি। একটা পাহাড়। একটা জাহাজ...

ভাবতে ভাবতে চোখ চকচক করতে লাগল ষষ্ঠীর। বিড়বিড় করে বলল, "জয় মা কালী। বুকে সাহস দে মা। মাথায় বুদ্ধি দে মা। গায়ে জোর দে মা।"

বলে ষষ্ঠী কালী স্যাকরার দোকান থেকে বেরিয়ে হনহন করে হেঁটে বাঁশবন পেরিয়ে শর্টকাট ধরে আমবাগানে এসে ঢুকল।

হঠাৎ একটা ক্রুদ্ধ 'গর্‌র্ আওয়াজ পেয়েই ষষ্ঠী একলাফে নিচু একটা গাছের ডাল ধরে ঝুল খেয়ে ভোজালি সমেত ঝটপট গাছে উঠে পড়ল। বুকে ধাঁই-ধপাধপ শব্দ হচ্ছে। এই আমবাগানে বাঘ থাকার কথা নয়। তবে এল কোত্থেকে?

তবে কিনা ষষ্ঠীর পাকা কান। একটু শুনেই বুঝল, বাঘ নয়। নাক ডাকছে।

সাহসে ভর করে ষষ্ঠী নেমে এসে দরোয়ানদের ঝোপড়ির দিকে এগিয়ে গিয়ে দেখল দুই মুশকো ভোজপুরী মাটিতে কুমড়ো-গড়াগড়ি খেয়ে ঘুমোচ্ছে। নাকের কী ডাক রে বাবা!

ষষ্ঠী খুব আহ্লাদের সঙ্গে ফিকফিক করে হাসল। ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যই। এই দুটো দরোয়ান প্রায়ই রাতবিরেতে "কে রে? কৌন হ্যায় রে?" বলে এমন চেঁচায় যে, ষষ্ঠীর পিলে চমকে যায়। একবার তো একজনের লাঠি খেতে খেতে দৌড়ে পালিয়ে কোনওরকমে বেঁচে গিয়েছিল সে। দু'জনের সামনে দুটো লোটা দেখে ষষ্ঠী আর লোভ সামলাতে পারল না। তুলে নিল। পুকুরে ডুবিয়ে দেবে। পরে তুলে নিলেই হবে।

মা লক্ষ্মী এভাবেই তো দেন। হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা কি ঠিক? এক হাতে দুটো লোটা আর অন্য হাতে ভোজালিটা বাগিয়ে ধরে ষষ্ঠী ঘুটঘুট্টি অন্ধকারে রতন বাঁড়ুজ্যের বাড়ির দিকে এগোল। পথেই পুকুরটা পড়বে।

বেশ নিশ্চিন্ত মনেই এগোচ্ছিল ষষ্ঠী। মনটায় একটু স্ফূর্তিও আছে। ধর্মের কল যে বাতাসে নড়ে তা এই একটু আগে নিজের চোখেই দেখেছে ষষ্ঠী। তার মনে হচ্ছে ভগবান যখন এতটাই দেখলেন, আর একটু কি দেখবেন না? ওই এঁচোড়ে-পাকা ছোঁড়াটার কাছ থেকে হিরের আংটি সমেত কালীদার চুরি-যাওয়া গয়না আর টাকা হাতাতে পারলে তাকে আর পায় কে?

কিন্তু একটা খটকাও লাগছে ষষ্ঠীর। ছোঁড়াটা যখন ঘুমোচ্ছিল তখন সে নিজে হাতে ঘরের মধ্যে ঘুমের ওষুধ স্প্রে করেছে। সে এমনই তেজালো ওষুধ যে হাতিরও সে ঘুম সহজে ভাঙার কথা নয়। কিন্তু ছোকরা সেই ওষুধের ক্রিয়া এমন চট করে কাটিয়ে উঠল কী করে? তার ওপর তারা দু' দুটো হুমদো লোক বাড়ির চৌহদ্দিতে ঢোকার পরও রতন বাঁড়ুজ্যের বাঘা কুকুরটা একবারও ডাকল না কেন?

ষষ্ঠী আমবাগান পার হয়ে ফাঁকা জমিতে পা রাখতেই মুখে ঝপাস করে একটা টর্চের আলো এসে পড়ল।

"আরে! কানাইবাবু যে?"।

গলার স্বরটা এক লহমায় চিনে ষষ্ঠী খুব বিনয়ের সঙ্গে একটু হাসল, "হেঃ হেঃ, এই একটু ঘুরে-টুরে দেখছি আর কি! বড্ড গরম কিনা ঘরে।"

"তা ভাল। তবে হাতে ও দুটো কী? পেতলের ঘটি দেখছি...!"

ষষ্ঠী শশব্যস্তে বলল, "আর বলবেন না, লোকের বড় ভুলো মন হয়েছে আজকাল। কে যেন ফেলে গেছে আমবাগানে। হোঁচট খেয়ে পড়েই যাচ্ছিলাম। তাই ভাবলাম পুকুরে ফেলে দিয়ে আসি।"

"কিন্তু কানাইবাবু, আপনার ডান হাতে একটা ভোজালিও দেখছি না?"

ষষ্ঠী জিব কাটল। তারপর অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে ভোজালিটার দিকে একটু চেয়ে থেকে চোখ মিটমিট করতে-করতে বিগলিত মুখে বলল, "আজ্ঞে, আমিও দেখছি। কিন্তু কোত্থেকে যে জিনিসটা এল, তা বুঝতে পারছি না। এই ছোরা-টোরা খুব খারাপ জিনিস, আমি লোককে সে-কথা বলিও।"

টর্চের আলোয় তাকে আপাদমস্তক ভাল করে দেখে নিয়ে ছোকরাটা বলল, "ছোরায় সব সময় কাজও হয় না। তাই না?"

ষষ্ঠী বিগলিত মুখে বলল, "আজ্ঞে, সে আর বলতে?"

"কিন্তু আপনার কপালটা যে বেশ ফুলে আছে কানাইবাবু? পড়ে-উড়ে যাননি তো?"

ষষ্ঠী খুবই উদার স্বরে বলল, "সে আর বিচিত্র কী? কোথাও অন্ধকারে ঢুসোটুসো লেগে থাকবে। তবে আমার এ আর কী দেখছেন? অন্যদের আরও কত হয়ে আছে তার হিসেব কে জানে।"

"তা বটে।" বলে ছোকরা একটু হাসল। তারপর টর্চের আলোটা নিবিয়ে দিয়ে বলল, "আপনি বেশ ভাল লোক কানাইবাবু। এ অঞ্চলে আমি আর আপনার চেয়ে ভাল লোক দেখিনি।"

"আজ্ঞে কথাটা আমারও মাঝে-মাঝে মনে হয়। একটু-আধটু যা করে ফেলি তা ওই কুসঙ্গে পড়ে।"

"তা বটে। আপনার ওই স্যাকরা লোকটিও বেশ ভাল। আমার তো ধারণা ছিল আংটিটার জন্য পঞ্চাশ টাকাও পাব না। কিন্তু স্যাকরার দয়ার শরীর বলে আমার দুর্দশা দেখে চারশো টাকা দিয়েছেন। ভারী ভাল লোক কালী-স্যাকরা। এখানে দেখছি ভাল লোকের সংখ্যাই বেশি।"

এই কথায় ষষ্ঠী একটু বিনয় দেখাতে গিয়ে মাথা হেঁট করে ঘাড় চুলকোতে গেল। বে-খেয়ালে ভোজালিসুদ্ধু হাত ঘাড়ে তুলে জিব কেটে হাতটা তাড়াতাড়ি নামিয়ে বলল, "যে আজ্ঞে। তা হলে এবার আমি আসি গিয়ে। বাড়িটা ফাঁকা পড়ে আছে। ইদিকে বড় চোর-ছ্যাঁচড়ের উপদ্রব কিনা।"

"চোর-ছ্যাঁচড়ও আছে নাকি এখানে? ওরে বাবা, তা হলে তো আপনার এক্ষুনি বাড়ি যাওয়া উচিত।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, যদি অনুমতি করেন।"

"আর এক দণ্ডও আপনার বাড়ির বাইরে থাকা উচিত নয়। যান, তাড়াতাড়ি বরং একটু জোর-পায়েই চলে যান।"

বলতে-বলতে ছেলেটা এগিয়ে এসে ষষ্ঠীর ঘাড়ে বন্ধুর মতো হাত রেখে, কিন্তু বেশ একটু চাপ দিয়ে ষষ্ঠীকে ঠেলে দিল। ওইটুকু চাপেই ষষ্ঠীর দম বেরিয়ে চোখ ডেলা পাকিয়ে উঠল ব্যথায়।ছোকরার হাতে যেমন বাঘের জোর তেমনি আঙুলেও ভেলকিবাজি আছে। রগ, শিরা, হাড়ের জোড় বুঝে গিয়ে মোক্ষম জায়গায় মোলায়েম করে চাপ দিয়ে প্রাণখানা টেনে বার করে দেয় আর কি।

ষষ্ঠী একবার "আঁক" শব্দ করেই বেশ দৌড়-পায়েই পালাল।

কিন্তু তার নাম ষষ্ঠীচরণ। আজ তার বড় অপমান গেছে।ছোকরাটা তিন-তিনবার তাকে ঘোল খাইয়েছে। টিকে অপমান করেছে না-হোক দু'বার। এর একটা পালটি না নিলে নিজের কাছেই তার ইজ্জত থাকে না। তার

ওপর নিজের জহুরির চোখ দিয়ে টর্চের আলোয় ছোকরার আঙুলের আংটিখানা সে একঝলক দেখে নিয়েছে। সেই আংটিটাই। দিব্যি পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ষষ্ঠী তাই পালিয়েও পালাল না। বিশাল আমবাগান, দেদার গাছ, অমাবস্যার ঘুটঘুট্টি অন্ধকার। কে কার ওপর নজর রাখবে। ষষ্ঠী একটা নধর গাছের গোড়ায় ভোজালি দিয়ে নিপুণ হাতে একটা গর্ত খুঁড়ে লোটাদুটো পুঁতে রাখল। তারপর বানরের মতো গাছ বেয়ে উঠে একটা বেশ হেলানো ডালে পা ঝুলিয়ে বসল। তার মন বলছে, একটা ঘটনা কিছু ঘটতে চলেছে। সে গন্ধ পায়।

॥ নয় ॥

গন্ধর্ব তার ঘরে নিঃসাড়ে ঘুমোচ্ছে। রাত্রি গভীর। চারদিক খুবই নিস্তব্ধ।

এমন সময়ে দরজায় মৃদু টোকা পড়ল।

"গন্ধর্ব! গন্ধর্ব! ওঠো।"

গন্ধর্ব চোখ মেলল। চকিতে উঠে বসল। চারদিকে বিদ্যুৎগতিতে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে সে খাট থেকে নামল।

দরজা খুলতেই তার ঘুমকাতর চোখ একটু বিস্ফারিত হয়ে গেল। চৌকাঠে দাঁড়িয়ে আছেন রতনবাবু এবং তাঁর পিছনে দু'জন বিকট চেহারার সন্ন্যাসী।

রতনবাবু মৃদুস্বরে বললেন, "গন্ধর্ব, এরা শ্বেত আর লোহিত।তোমার দাদুর বিশ্বস্ত দুই সহচর।"

গন্ধর্ব একটা হাই চাপল। তারপর বিড়বিড় করে বলল, "শ্বেত আর লোহিত! শ্বেত আর লোহিত..."।

বলতে বলতেই তার চোখের ধোঁয়াটে ভাব কেটে উজ্জ্বলতা ফুটে উঠল। মুখে দেখা দিল হাসি। সে বলল, "হ্যাঁ, শ্বেত আর লোহিতের কথা দাদুর কাছে শুনেছি। আপনারা ঘরে আসুন।"

ঘরে ঢোকার পর উজ্জ্বল আলোয় সন্ন্যাসী দু'জনকে ভাল করে দেখল গন্ধর্ব। দু'জনের চেহারাই হুবহু একরকম। একই উচ্চতা, একই স্বাস্থ্য, একই রকম নাক চোখ মুখ। শুধু একজনের গায়ের রং ফর্সা, অন্যজনেরটা একটু তামাটে। দু'জন সন্ন্যাসীই অত্যন্ত কুটিল ও ঘোর সন্দিহান চোখে তাকে নিরীক্ষণ করছিল। মুখে কথা নেই।

শ্বেত এক পা এগিয়ে এসে খুব সটান হয়ে দাঁড়িয়ে তার চোখে দুই ভয়ংকর চোখ রেখে বলল, "বৈশাখী অমাবস্যা অবসানপ্রায়। আগামী পূর্ণিমায় অভিষেক। শুরু হোক দিগ্বিজয়। এবার আপনার সংকেতবাক্য বলুন।"

গন্ধর্ব মৃদু একটু হেসে বলল, "জলে অমৃত, বায়ুতে অমৃত, রৌদ্রে অমৃত।"

শ্বেত সহর্ষ বজ্রধ্বনিতে বলে উঠল, "সাধু। এবার আপনার অঙ্গুরীয় প্রদর্শন করুন।"

গন্ধর্ব তার হাত বাড়িয়ে দিল। অনামিকায় ঝকঝক করছে আংটি।

শ্বেত আর একবার বজ্রনিনাদে বলল, "সাধু। রাজা রামদুলালের বংশরক্ষাকারী কুমার গন্ধর্বের জয় হোক। আমরা আপনার ভৃত্য, আমাদের বংশধরেরাও আপনার এবং আপনার বংশধরদের আজ্ঞাবাহী হয়ে থাকবে।"

গন্ধর্ব হাত তুলে রাজকীয় ভঙ্গিতে বলল, "শুভম্।"

শ্বেত এবার গন্ধর্বকে নিচু হয়ে প্রণাম করে রতনবাবুর দিকে ফিরে তাকাল। মৃদু গম্ভীর স্বরে বলল, "কুমার গন্ধর্বনারায়ণ যথাসময়ে আপনার কাছে উপস্থিত হয়ে শর্ত পালন করেছে।"

রতনবাবু অবিচলিত গলায় বললেন, হ্যাঁ।"

"সাধু। শর্ত ছিল গন্ধর্বনারায়ণ যথাসময়ে উপস্থিত হয়ে তার সম্পত্তি দাবি করলে সবই আপনি ফিরিয়ে দেবেন।"

"হ্যাঁ।"

"সাধু। এবার আপনার কাছে গচ্ছিত সম্পত্তির প্রতিভূ হিসেবে অঙ্গুরীয় প্রদর্শন করুন। আমরা দুটো আংটি মিলিয়ে দেখব।"

রতনবাবু অবিচলিত স্বরে বললেন, "আংটি চুরি গেছে।"

ঘরের মধ্যে বজ্রপাত ঘটলেও যেন এর চেয়ে বেশি হতবাক কেউ হত না। কয়েক সেকেণ্ড ঘরে এমন নিস্তব্ধতা নেমে এল যে, এ ওর হৃৎপিণ্ডের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিল।

নীরবতা ভাঙল শ্বেত। মন্দ্রস্বরে সে বলল, "চুরি! আংটি চুরি যাওয়ার দণ্ডের কথা আপনি বিস্মৃত হননি তো!"

রতনবাবু মাথা নেড়ে বললেন, "না।"

শ্বেত একটু হাসল। তারপর চাপা হিংস্র স্বরে বলল, "সাধু। এসব সম্পত্তি, এই বাড়ি এবং অন্যান্য যা আছে তার দলিল কার নামে রতনবাবু?"

রতনবাবু পিছন দিকে হাত বাড়াতেই দরজার ওপাশ থেকে পাঁচুর প্রেতসদৃশ একখানা হাত এগিয়ে এল। একতাড়া দলিল-দস্তাবেজ বাণ্ডিলে বাঁধা।

রতনবাবু বাণ্ডিলটা শ্বেতের হাতে দিয়ে বললেন, "রামদুলাল রায়কে কথা দিয়েছিলাম যে, সব সম্পত্তিই তার নাতির নামে হবে। একজিকিউটার আমি। সব সম্পত্তিই তাই নাবালক গন্ধর্বের নামেই রয়েছে। এতকাল আমি সেই সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ ও ভোগ-দখল করেছি। কিন্তু এই সম্পত্তির পরিমাণ সামান্যই। গন্ধর্বের জন্য গচ্ছিত আছে এক বাক্স ভর্তি মোহর, মূল্যবান পাথর, নানারকম অলঙ্কার।তার দাম বহু লক্ষ টাকা। ব্যাঙ্কের লকার থেকে আমি তা তুলে এনে রেখেছি। পাঁচু!"

সঙ্গে-সঙ্গে পাঁচু একটা চমৎকার পেতলের কারুকাজ-করা মাঝারি মাপের বাক্স অতি কষ্টে বয়ে ঘরে নিয়ে এল এবং মেঝের ওপররেখে নিঃশব্দে অদৃশ্য হয়ে গেল।

রতনবাবু ডালাটা তুলে ধরতেই গন্ধর্বের চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল। তারপর প্রসন্নতায় ভরে গেল তার মুখ।

শ্বেত দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, "তবু এ বাক্সের শ্রেষ্ঠ সম্পদটিই নেই রতনবাবু। আপনি ভালই জানেন ওই আংটির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে এই বংশের ভাগ্য।"

"জানি। কিংবদন্তি তাই বলে।"

শ্বেত গন্ধর্বের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, "কুমার, এখানে আপনার আর কালক্ষেপের প্রয়োজন নেই। লোহিত আপনার পেটিকা বহন করে নিয়ে যাবে। শহরের বাইরে আপনার জন্য একটি দ্রুতগামী যান প্রস্তুত রয়েছে। আপনি যাত্রা করুন। আমি সামান্য একটি কর্তব্য সেরেই আসছি। অনেক দিনের পুরনো একটা ঋণ শোধ করতে হবে।"

গন্ধর্ব কোনও কথা বলল না। তবে তার দুটি সুন্দর আয়ত চোখে একবার রতনবাবু এবং আর একবার শ্বেতের দিকে পর্যায়ক্রমে তাকিয়ে দেখল।

লোহিত এতক্ষণ কোনও কথা বলেনি। এবার পেটিকাটি একটা কাপড়ে মুড়ে কাঁধে তুলে নিয়ে বলল, "চলুন কুমার। দেরি হলে চলবে না। পথ অনেক।"

গন্ধর্ব মাথা নাড়ল।

ঘরে যখন এই নাটক চলছে, তখন জানালার বাইরে কলাবতীঝোপের মধ্যে বসে-থাকা ষষ্ঠীর চোখে পলক পড়ছিল না। পেতলের বাক্সের ভিতরটা সে দূর থেকে দেখেছে। যা দেখেছে তাতে তার চোখ এমন ধাঁধিয়ে গেছে যে, সে আর চোখের পাতা ফেলতেই পারছে না। এত দামি জিনিস কালী-স্যাকরাও সাতজন্মে দেখেনি। ওই পুঁচকে ছোঁড়াটা ওই অত সব সোনাদানা হাতিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে কালীদার কয়েক লাখ টাকা। টিকের দশ হাজার। সেই সঙ্গে ষষ্ঠীর পাঁচশো।

উত্তেজনায়, রাগে ষষ্ঠীর গায়ের রোঁয়া দাঁড়িয়ে যেতে লাগল।

গা-ঝাড়া দিয়ে উঠতে যাচ্ছিল ষষ্ঠী, ঠিক এই সময়ে কে যেন ক্যাঁক করে ঘাড়টা চেপে ধরল। আর সেই সঙ্গে আর একখানা হাত এসে চাপা দিল তার মুখে।

অন্ধকারে দেখতে পেল না ষষ্ঠী, তবে যেই হোক তার গায়ে বেশ জোর আছে। অসুরের জোর। ষষ্ঠীকে ওই অবস্থায় প্রায় শূন্যে তুলে এক ঝটকায় অনেকটা দূরে নিয়ে এনে ফেলল।.

জায়গাটা নির্জন। চারদিকে কাঁটাঝোপ।

"তুই ষষ্ঠী-চোর না?"

ষষ্ঠী দেখল, সামনে রতনবাবুর ছোট ছেলে বিরু দাঁড়িয়ে। ষষ্ঠী এই ছোকরাকে একটু ভয় খায়। ভারী গেরামভারী, রাগ-রাগ চেহারা। একটু গুণ্ডাপ্রকৃতিরও বটে। পাশে আবার ফিচেল ভাইপো হাবুলটাও দাঁড়িয়ে আছে।

ষষ্ঠী মাথা নুইয়ে বলল, "আজ্ঞে হ্যাঁ। তবে আপনাদের বাড়িতে আমার চুরি করতে আসা নয়। ওই যে গন্ধর্ব না কি ওই ছোঁড়া, সে আজ আমাদের কী সর্বনাশ করেছে তা যদি শুনতেন! একেবারে সর্বস্বান্ত করে ছেড়েছে। রাজপুত্তুর না কী যেন শুনলাম। ছ্যাঃ ছ্যাঃ, ওই যদি রাজপুত্তুর হয় তো তার চেয়ে আমাদের মতো চোর-ছ্যাঁচড় ভাল।"

বিরু ষষ্ঠীকে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, "বেশি সময় নেই। যা ঘটেছে তা ঠিক পাঁচ মিনিটে বলে ফেল। আমি ঘড়ি দেখছি।"

পুরো পাঁচ মিনিটও লাগল না। চার মিনিট তিপ্পান্ন সেকেণ্ডে ষষ্ঠী সব বলে ফেলল। কিছু বাকি রাখল না।

বিরু ষষ্ঠীর দিকে চেয়ে বলল, "এবার যা করতে বলব তা ঠিক-ঠিক করবি। একটু এদিক-ওদিক করিস না। যদি করতে না পারিস তবে এই এলাকা থেকে একেবারে দূর করে দেব। বুঝেছিস?"

ষষ্ঠী বুঝে গেছে। এও বুঝেছে ওই ছোকরার সঙ্গে টক্কর দেওয়া তার একার কম্ম নয়। তবে বিরুবাবুর কথা বলা যায় না। সে মাথা নেড়ে বলল, "গরিবের প্রাণটা যাতে না যায় সেটা একটু দেখবেন তো?"

বিরু বলল, "প্রাণ যাবে না। এখন মন দিয়ে শোন। ভুল করিস না..."

পেতলের বাক্সটা মন-খানেকের ওপর ভারী। এই ভারী বাক্স টানতে লোহিতের অবশ্য তেমন কোনও কষ্ট হচ্ছিল না। বয়স সত্তর হলেও তার শরীর পালোয়ানের মতো! দু'খানা হাত যেন দু'খানা লোহার মুগুর।

তবে বাক্সটা বার-বার কাঁধ বদলে বহন করতে হচ্ছে। প্রচণ্ড গরম বলে ঘামও হচ্ছে তার। বেশি জোরে হাঁটা সম্ভব হচ্ছে না। পথও অনেকখানি।

খুব ধীরে-ধীরে হেঁটে গন্ধর্ব আর লোহিত আমবাগানের ছায়ায় ঢুকল। গন্ধর্বের হাতে টর্চ। মাঝে-মাঝে আলো ফেলছে পথ দেখার জন্য। কেউ কোনও কথা বলছে না।

হঠাৎ পিছন থেকে খুব বিনীত কণ্ঠে কে যেন বলে উঠল, "তা কুমারবাহাদুর কি চললেন?"

গন্ধর্ব চিতাবাঘের মতো ঘুরে দাঁড়াল। টর্চের আলো গিয়ে পড়ল ষষ্ঠীর বিগলিত মুখে। চোখ মিটমিট করে দেঁতো-হাসি হাসছে। কুঁজো হয়ে দু'হাত কচলে ভারী বিনয়ী ভাবভঙ্গি করছে সে।

গন্ধর্ব ব্যঙ্গের স্বরে বলল, "আরে কানাইবাবু! একটু আগে যে আপনাকে বাড়ি রওনা করে দিয়ে গেলাম! চোর-ছ্যাঁচড়ের উৎপাতের কথা বলছিলেন যে!"

ষষ্ঠী খুব বিগলিত হেসে বলল, "আজ্ঞে মনটা কেমন উড়ু-উড়ু করছিল তখন থেকে। ভাবছিলাম আপনার মতো এত বড় একজন গুণী লোককে কাছে পেয়েও কিছু শিখে না নিলে খুবই লোকসান হবে। এত বিদ্যে, এত নিখুঁত হাতসাফাই, এসব আর এ তল্লাটে কে শেখাবে বলুন। এসব ভেবে ঘরে গিয়েও তিষ্ঠোতে পারলাম না। ভাবলাম, যাই, কুমারবাহাদুরের দোরগোড়ায় গিয়ে হত্যে দিয়ে পড়ে থাকি। এই যাওয়ার পথেই আপনার সঙ্গে দেখাটা হয়ে গেল। তা কোথায় চললেন আজ্ঞে?"

গন্ধর্ব একটু কঠিন স্বরে বলল, "কিসের বিদ্যে আর কিসেরই বা হাতসাফাই বলুন তো! আমি তো কিছুই জানি না।"

"আজ্ঞে, গুণীদের তো বিনয় থাকবেই। তবে কিনা এই গরিবকে কেন মিছে ছলনা করছেন কুমারবাহাদুর? নিজের চোখে না দেখলে প্রত্যয় হত না।" বলতে-বলতে ষষ্ঠী আনন্দাশ্রু বিসর্জন করতে লাগল। ধুতির খুঁটে চোখ মুছতে-মুছতে বলল, "আহা, কী দেখলাম! চোখ যেন জুড়িয়ে গেল। অমন ধুরন্ধর কালী-স্যাকরা পর্যন্ত স্বীকার করল, হ্যাঁ, ওস্তাদ লোক বটে। তারপর টিকে গুণ্ডার মতো দশাসই লাশটাকে কী হেনস্থাই করলেন। এইটুকু বয়সে এমন উঁচু দরের ওস্তাদ হলেন কী করে সেটাই ভেবে অবাক হচ্ছি।"

লোহিত এতক্ষণ অন্ধকারে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে ছিল। পেতলের বাক্সটা এক কাঁধ থেকে আর এক কাঁধে চালান করে সে এবার একটা বাঘা ধমক দিল, "চোপ কর বেয়াদপ! কার সঙ্গে কথা বলছিস জানিস?"

ষষ্ঠী তিন হাত লাফিয়ে উঠে বুকে হাত চেপে ধরে জুলজুল করে চেয়ে বলল, "ওরে বাবা রে? উটি আবার কে কুমারবাহাদুর? মানুষের মূর্তি দেখছি। ও বাবা, ওর যে আবার সন্ন্যাসীর ভেক।"

লোহিত বাক্সটা মাটিতে নামিয়ে রেখে ত্রিশূলটা বাগিয়ে ধরে গন্ধর্বকে জিজ্ঞেস করল, "লোকটা কে কুমার?"

গন্ধর্ব মৃদু হেসে বলল, "কানাইবাবু, ভাল লোক। তবে দোষের মধ্যে রাতের বেলা একটু বেরোন-টেরোন আর কি।"

লোহিত ত্রিশূলটা তুলে বলল, "দশ গুনতে-গুনতে হাওয়াহয়ে যা। নইলে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দেব।"

ষষ্ঠী কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, "কিন্তু আমি তো কিছু করিনি। কুমারবাহাদুরকে শুধু গুরু বলে মানছি। উনি যদি আমাকে শিষ্য করে নেন তো চিরজীবন কেনা গোলাম হয়ে থাকব। আমার কথায় বিশ্বাস না হয় ওঁর কোমরের গেঁজেটা খুলে দেখুন। কালী-স্যাকরার সর্বস্ব ওর মধ্যে আছে।"

লোহিত একটু বিরক্তির স্বরে গন্ধর্বকে বলল, "এ লোকটা কী বলছে? কালী-স্যাকরার কাছ থেকে..."

গন্ধর্ব মৃদু স্বরে বলল, "তেমন কিছু নয়। পরে বলব।"

লোহিত যেন এ কথায় খুশি হল না। বিড়বিড় করে বলল, "কথাটা আগে বলা উচিত ছিল।"

গন্ধর্ব মিনমিন করে বলল, "সময় পেলাম কই! বলতাম ঠিকই।"

লোহিত হাত বাড়িয়ে বলল, "গেঁজেটা দেখি।"

গন্ধর্ব তার কোমরে হাত চেপে ধরে বলল, "না। এটা আমার রোজগার।"

লোহিত বাঘা গলায় বলল, "চালাকি কোরো না। তাতে ভাল হবে না। রাজার ছেলের মতো আচরণ না করে চোরের মতো করেছ। স্বভাব যাবে কোথায়? এখন গেঁজেটা দাও। যা আছে তার বখরা সবাই পাবে।"

বলতে-বলতে লোহিত ষষ্ঠীর দিকে একবার তাকাল। কিন্তু ষষ্ঠী কোথায়? তার চিহ্নও নেই।

লোহিত চকিতে চারদিকে চাইল। তারপর পেতলের বাক্সটা টপ করে ঘাড়ে তুলে নিয়ে বলল, "লোকটা পালিয়েছে। আর দেরি করা ঠিক নয়। তাড়াতাড়ি চলো।"

বলে লোহিত পা বাড়াতেই ঝপ করে একটা মাছধরার জাল নিখুঁতভাবে এসে তাকে ছেয়ে ফেলল। টাল সামলাতে না পেরে বাক্স সমেত দড়াম করে পড়ে গেল সে।

একটা টর্চের আলো এসে পড়ল গন্ধর্বের মুখে। একটা গম্ভীর গলা বলে উঠল, "এই যে নকল নারায়ণ রায়, অভিনয়টা চমৎকার করে গেছ ভাই। শুধু এই শেষ সময়টায় ফেঁসে গেলে।"

গন্ধর্ব সামান্য একটু হাসল। তারপরই একটা চিতাবাঘের মতো ক্ষিপ্রতায় মাথার ওপর একটা ডাল লাফিয়ে ধরে তীব্র একটা ঝুল খেয়ে সে পা বাড়িয়ে টর্চধারীর হাতে লাথি মারল। টর্চটা উড়ে গিয়ে গাছের ডালে আটকে রইল।

অন্ধকারে তখন শুরু হল এক দারুণ লড়াই।

কে জিতছে, কে হারছে তা বলা শক্ত। তবে দু'পক্ষই বোঝা গেল শক্ত ধাতের লোক। কেউ কারও চেয়ে কম যায় না। ঘুসি, লাথি, ক্যারাটে, কুংফু সব কিছুই চলতে লাগল।

॥ দশ ॥

আমবাগানের পশ্চিম দিকটায় বাঁশঝাড়ের পাশে নির্জন জায়গায় একটা শুকনো খাদের ধারে এসে দাঁড়াল শ্বেত। হাতে ভয়ংকর শূল। মুখে একটা নিষ্ঠুর হাসি।

তার পিছনে রতনবাবু। তাঁর মুখে হাসি নেই, ভয়ও নেই।

শ্বেত বলল, "রতনবাবু, অনেকদিন ধরেই আমি এই মুহূর্তটির অপেক্ষা করছিলাম। রাজাসাহেবকে বশ করে একসময়ে তুমিই রাজ্যপাট চালাতে শুরু করেছিলে। রাজবাড়ির গুপ্তধন আবিষ্কার করে সেটা রাজাকে দিয়ে তুমি একটু সততার পরিচয় দিয়েছিলে ঠিকই, কিন্তু সেই গুপ্তধনের জন্যই রাজপরিবারে অশান্তি নেমে আসে। তোমার ষড়যন্ত্রেই গুপ্তধনের কথা ফাঁস হয়ে যায়। আর তার ফলেই রামদুলাল প্রায় নির্বংশ হয়ে যান। আজ তোমাকে বধ করে সেই ঘটনার শোধ নেব।"

রতনবাবু অকম্পিত কণ্ঠে বললেন, "সব জানি হে শ্বেত। নির্লোভ, সদাচারী, সত্যনিষ্ঠ দেখে রামদুলাল আমাকে তাঁর কাছে রেখেছিল। কিন্তু তোমরা আমাকে সহ্য করতে পারতে না। আমি অনেক জোচ্চুরি, বাটপাড়ি ধরে ফেলতাম। তোমরা তক্কে-তক্কে ছিলে আমাকে নিকেশ করার জন্য। রামদুলালের জন্য তখন পারোনি। স্বজন-বিদ্রোহে রামদুলালের পরিবার শেষ হয়ে যাওয়ায় আর আমি চলে আসায় তোমাদের সুযোগ হাতছাড়া হয়। আজ সুযোগ পেয়েছ। মারো আমি এই তৃপ্তি নিয়ে মরব যে, আমি আজও সত্যনিষ্ঠ, সত্যবাদী।"

শ্বেতের চোখ অন্ধকারে একবার জ্বলে উঠল। গম্ভীর স্বরে সে বলল, "ইষ্টনাম স্মরণ করো রতনবাবু।"

"করছি। আমি সর্বদাই ইষ্টনাম স্মরণ করি।"

শ্বেত তার ভয়ংকর তীক্ষ্ণ শূল উদ্যত করল। রতনবাবু নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইলেন।

ঠিক এই সময়ে একটা গুলতির গুড়ুল এসে টং করে শূলের গায়ে লাগল। আর একটা এসে লাগল শ্বেতের কপালে।

"ওফ্।" বলে বসে পড়ল শ্বেত। তারপর কপালটা চেপে ধরে বলে উঠল, "বিশ্বাসঘাতক।"

রতন বাঁড়ুজ্যে অবাক হয়ে দৃশ্যটা অনুধাবন করার চেষ্টা করছিলেন।

বাঁশঝোপের অন্ধকার থেকে ছায়ামূর্তির মত হাবুল বেরিয়ে এসে বলল, "দাদু, আমি হাবুল।"

রতন বিরক্ত স্বরে বললেন, "এ-কাজ কেন করলে? আমাকে সত্যরক্ষা করতেই হবে।"

হাবুল দাদুকে জড়িয়ে ধরে বলল, "কার কাছে সত্যরক্ষা দাদু? এ লোকগুলো যে ভীষণ পাজি। গন্ধর্ব মোটেই রামদুলালের নাতি নয়। আর তোমার কাছ থেকে হিরের আংটিও সে-ই চুরি করে নিয়ে যায়।"

"বলিস কী? কে বলল এ-কথা?"।

অন্ধকার ফুঁড়ে আরও দুই মূর্তি এগিয়ে এল। একজনের হাত পিছমোড়া করে বাঁধা। অন্যজন তাকে কোমরে দড়ি বেঁধে টেনে আনছে।

"গন্ধর্ব নিজেই স্বীকার করেছে বাবা।"

রতনবাবু কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। হাতবাঁধা গন্ধর্বের মুখে বিরু টর্চের আলো ফেলল। মুখটা রক্তাক্ত, ঠোঁট কেটেছে, কপাল ঢিবি হয়ে আছে, গায়ে ধুলো ময়লা।

রতনবাবু বললেন, "ও রামদুলালের নাতি নয়?"

বিরু বলল, "না। ওর হাবভাব দেখে আমার প্রথম থেকেই সন্দেহ হয়েছিল। তারপর ষষ্ঠীর কাছে শুনলাম ও নাকি চুরি হাতসাফাই আর ছিনতাইয়ের ওস্তাদ লোক। কালী-স্যাকরার দোকান দু'বার লুঠ করেছে। ষষ্ঠী আর টিকের কাছ থেকে টাকা ছিনতাই করেছে। তার ওপর শুনলাম, সে কুকুরটাকে বশ করতে পারে। তখনই মনে হল আপনার মতো সাবধানী লোকের ঘর থেকে আংটি চুরি করা তো যেমন-তেমন চোরের কাজ নয়, এরকম ধুরন্ধর লোকই তা পারে। তবু সন্দেহ দূর করার জন্য ষষ্ঠীকে কাজে লাগিয়ে দিয়ে আমি আমবাগানে

লুকিয়ে ছিলাম। ষষ্ঠী যখন ফাঁস করে দিল যে কালী-স্যাকরার দোকান থেকে লুটকরা সোনা-দানা সব গন্ধর্বের কোমরে গেঁজের মধ্যে আছে তখনই লোহিতের সঙ্গে গন্ধর্বের বখরা নিয়ে লেগে গেল। বুঝতে পারলাম যে, এরা সাঁট করে এসেছে। গন্ধর্ব একটি পাকা চোর, শ্বেত আর লোহিত ওর স্যাঙাত।"

রতনবাবু খেতের দিকে তাকালেন।

বিরুর টর্চের আলোয় শ্বেতের চোখ দু'খানা আর একবার ঝলসে উঠল। সে ধীরে-ধীরে উঠে দাঁড়াল। তারপর দু পা এগিয়ে গিয়ে বিরাশি সিক্কার একটা চড় কষাল গন্ধর্বের গালে। বলল, "গাধা কোথাকার! কয়েক ঘণ্টা বাদে রাজার ধন হাতে পেতিস। তাও লোভ সামলাতে পারলি না। ধরা পড়ে গেলি?"

গন্ধর্ব মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

শ্বেত রতনবাবুর দিকে ফিরে বিষণ্ণ গলায় বলল, "আমাদের নিয়ে কী করবে রতনবাবু? পুলিশে দেবে? দাও। আমাদের ফন্দি যে খাটল না তা কপাল খারাপ বলেই। এই লোভী ছেলেটা আমারই ছেলে। সঙ্গদোষে খারাপ হয়ে গেছে। তাই ভেবেছিলাম, ওর একটা হিল্লে করে দিয়ে যাব। তা আর হল না।"

রতনবাবু বললেন, "কিন্তু রামদুলাল আর তার আসল নাতি কোথায়?"

শ্বেত বিষণ্ণ গলায় বলল, "আজ আর বলতে বাধা নেই। রামদুলাল পালালেও বেশিদিন আত্মরক্ষা করতে পারেনি। শত্রুপক্ষের গুপ্তঘাতকরা তাকে খুঁজে বের করে হাজারিবাগের জঙ্গলে মেরে ফেলে। নাতিরও একই দশা হয়েছিল। সে-খবর আমরা তোমাকে জানাইনি, তোমাকে নিষ্কণ্টক হতে দেব না বলেই। তবে এটা স্বীকার করছি রতনবাবু, তোমার বুকের পাটা আছে। তুমি সত্যবাদী, সৎ, প্রকৃত ব্রাহ্মণ। লোভের বশবর্তী হয়ে তোমার সর্বনাশ করতে আজ এসেছিলাম বটে, কিন্তু মনে-মনে তোমাকে বাহাদুর বলে মেনেছি। এখন পুলিশ ডাকো রতনবাবু।"

রতনবাবু একটু হাসলেন। তারপর বললেন, "এর মধ্যে পুলিশকে ডাকার কোনও মানে হয় না। আজ রাত পোয়ালেই রামদুলালের শর্তের সময় পার হয়ে যাবে। তোমরাও আর আসবে না। আজ এই শেষ দিনটায় কোনও তিক্ততার স্বাদ রাখতে চাই না মুখে।তোমরা যাও। আমি তোমাদের ছেড়ে দিচ্ছি। সৎভাবে বেঁচে থাকার চেষ্টা করো।"

জালদড়ি দিয়ে বাঁধা লোহিতকে ঘটনাস্থলে টেনে আনছিল পাঁচু। মুখটা বিকৃত করে বলল, "কর্তাবাবুর কেবল ক্ষমা আর ক্ষমা। অন্তত পুকুরে দুটো চুবোন দিয়ে, মাথাটা কামিয়ে তবে না ছাড়া উচিত।"

রতনবাবু মাথা নেড়ে বললেন, "না, যথেষ্ট হয়েছে। এবার ওদের যেতে দাও।"

ভোর হয়ে আসছে। আমবাগানের মধ্যে স্নিগ্ধ একটু আলো ফুটে উঠল।

বাঁধন খুলে দেওয়ার পর শ্বেত, লোহিত আর গন্ধর্ব পাশাপাশি দাঁড়িয়ে সামান্য মাথা নত করে অভিবাদন জানাল রতন বাঁড়ুজ্যেকে। তারপর ধীরে-ধীরে হেঁটে চলে গেল।

ভোরের আলোয় গন্ধর্বের সুন্দর মুখখানা আর একবার দেখল হাবুল। তার মনে হল, অত সুন্দর চেহারা যার সে কেন এরকম নষ্ট হয়ে যাবে? হাবুল তার কাকার দিকে ফিরে বলল, "তুমি গন্ধর্বদার সঙ্গে গায়ের জোরে পারলে কী করে? ওর তো গায়ে দারুণ জোর।"

বিরু মৃদু একটু হেসে বলল, "গন্ধর্ব লোভী। সে লড়ছিল লোভের তেষ্টা মেটাতে। আর আমি লড়েছি আমার বাবার প্রাণ বাঁচাতে। ও আমার সঙ্গে পারবে কেন? তা ছাড়া কোনও মানুষই অতিমানুষ নয়।"

আগে-আগে রতনবাবু, তাঁর পেছনে হাবুল আর বিরু, সবশেষে পাঁচু পেতলের বাক্সটা ঘাড়ে করে আর দলিল-দস্তাবেজের বাণ্ডিল বগলে নিয়ে ফিরতে লাগল। রতনবাবু হিরের আংটিটা হাবুলের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, "তুমি আমার প্রাণরক্ষা করেছ। এটা আজ থেকে তোমার।বড় হয়ে পরো। এখন মায়ের কাছে গচ্ছিত রেখে দিও।"

একটু তফাতে থেকে ষষ্ঠী দৃশ্যটা দেখল। তার মনটা আজ খুশিতে ভরা। বিরুবাবু বলেছেন, পুরনো দরোয়ান দেশে যেতে চাইছে। তার জায়গায় ষষ্ঠীকে বহাল করা হবে।

ষষ্ঠী আমগাছতলায় মাটি খুঁড়ে লোটা দুটো বের করে আনল।

না, লোটা দুটো সে নেবে না। জীবনে এই প্রথম চুরির জিনিস ষষ্ঠী ফেরত দেবে। মনটা আজ বেশ ভালো লাগছে তো, তাই।